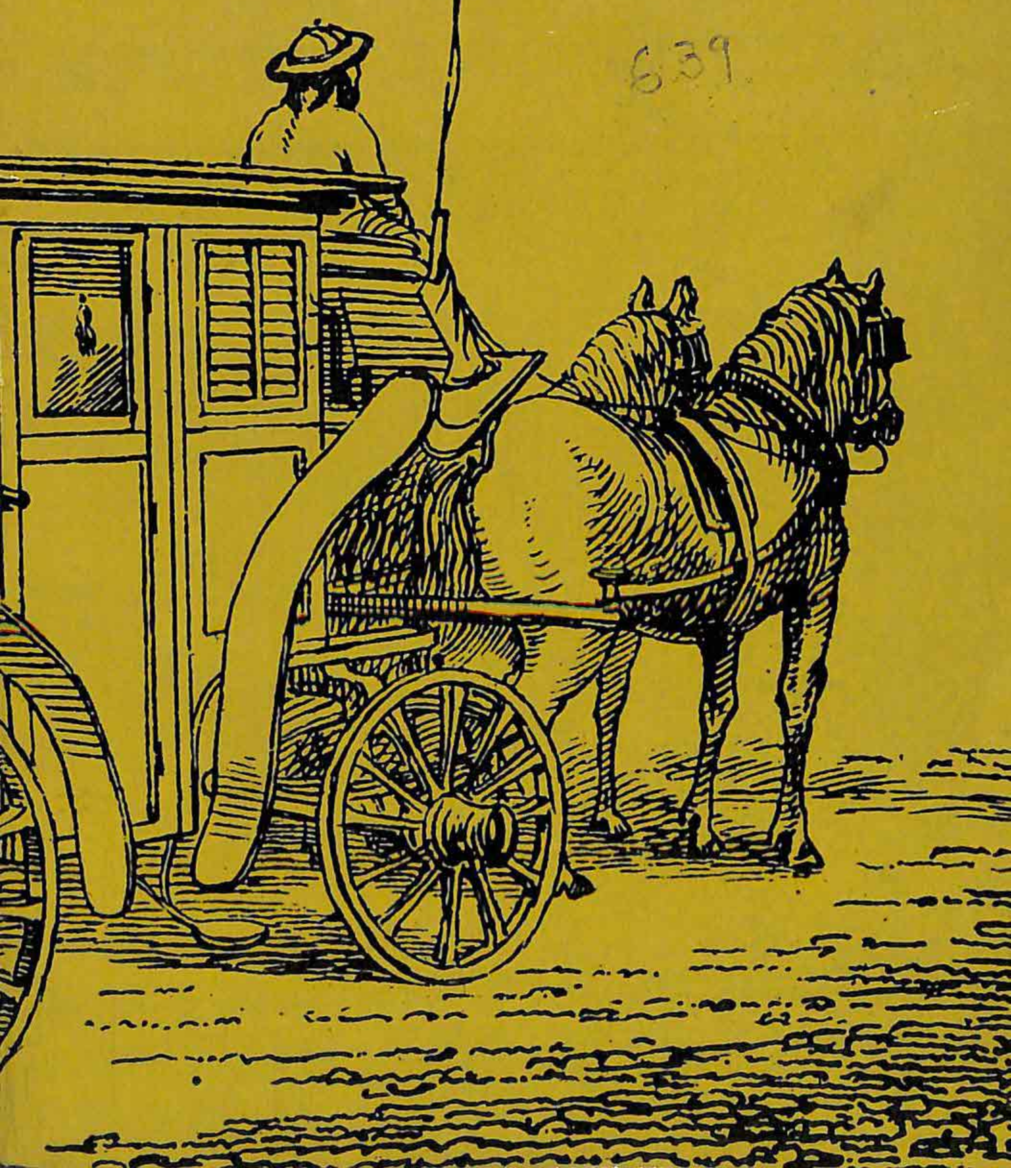
ছড়ায় মোড়া কলকাতা

পূর্ণেন্দু পত্রী



ছড়ায় মোড়া কলকাতা

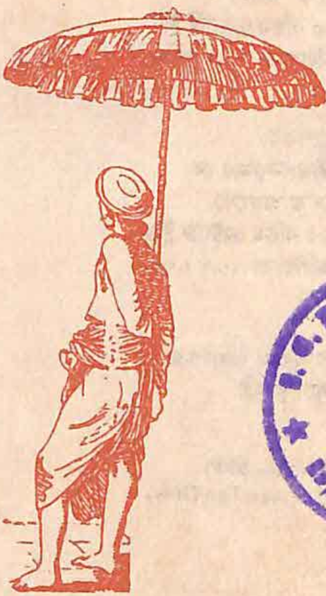


ছড়ায় মোড়া



পূর্ণেন্দু পত্রী

কলকাতা



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ
কার্তিক, ১৩৯৫
নভেম্বর, ১৯৮৮

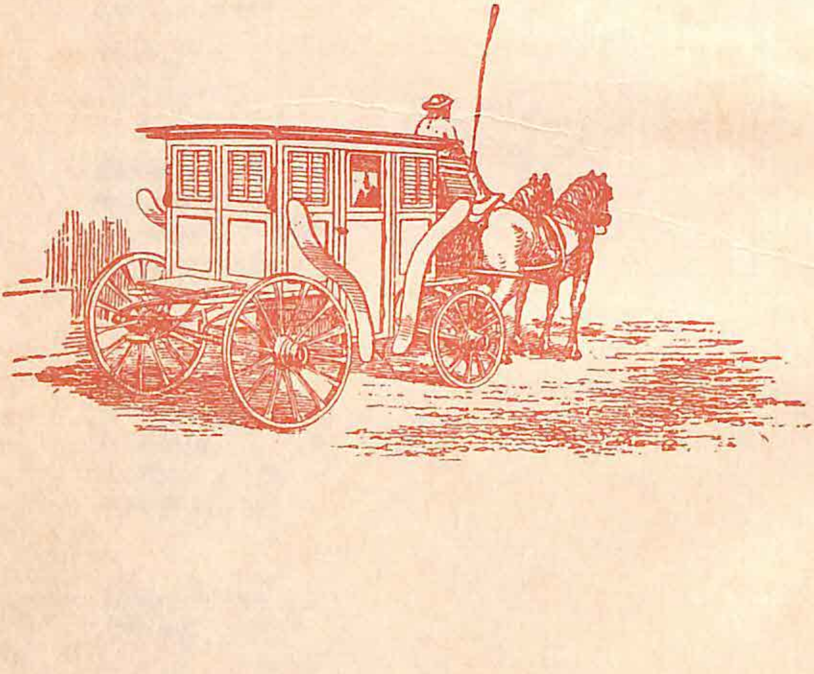
প্রকাশক
শ্রীসুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
শ্রীস্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম ১০ টাকা
(Rupees Ten Only)

টুটুলকে



আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে
শ্যাকড়া-গাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে,
দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে।
না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি।...
বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে
পান চিবোতে চিবোতে,
কেউ বা পাল্কি চ'ড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে।...
তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলী বাতি।
কেরোসিনের আলো যখন এল তার তেজ দেখে
আমরা অবাক। আমাদের পড়ার ঘরে জ্বলত
দুই সলতের একটা সেজ।

ছেলেবেলা ॥ রবীন্দ্রনাথ

লেখকের অন্যান্য বই

কলকাতার প্রথম
ওদের চোখে মোদের ভারত
হাসতে হাসতে খুন

ছড়ায় মোড়া কলকাতা কোনো বানিয়ে বলা কথা নয়। সত্যিই কলকাতাটা ছিল একসময়ে ছড়ায় মোড়া। কোথাও কিছু একটা ঘটলেই হল। অমনি কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও বানিয়ে ফেলবে একটা ছড়া। তারপর সেটা এমুখ-ওমুখ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সারা শহরে। পরে মানুষের মুখ থেকেই সে-সব ছড়া ঠাঁই পেয়ে যাবে বই-এর পাতায়। কলকাতায় যত ছড়া তৈরি হয়েছিল কলকাতারই ঘটনাবলী নিয়ে তার সবই যে ছাপার অক্ষরে ধরা আছে, তা হয়তো নয়। হারিয়েও গেছে অনেক বিস্মৃতির ভিতরে। শেষ পর্যন্ত যা রয়ে গেছে তাও অবশ্য কম নয়। আর ঐ সব ছড়া থেকে আমরা তখনকার পুরনো কলকাতাকে চিনে নিতে পারি অনেকখানি। কারণ এই সব ছড়ার মধ্যেই রয়ে গেছে একদিকে যেমন সমসাময়িক ইতিহাস বা কোনো বিশেষ ঘটনার ছাপ, অন্যদিকে তেমনি রয়ে গেছে সেই সব ঘটনা সম্পর্কে তখনকার অধিবাসীদের মনোভাবেরও ছবিটাও। সাধারণ অধিবাসীরাই বানিয়েছে সে-সব ছড়া। তাই তাদের মনের প্রতিক্রিয়াই যে ঐ সব ছড়ার অক্ষরে অক্ষরে, ছন্দে ছন্দে ফুটে থাকবে সে তো জানা কথাই। ছড়ার মাধ্যমেই

তারা তাদের উপরতলার অভিজাতশ্রেণীর আচার-আচরণের সমালোচনা করেছে কখনো। কখনো জানিয়েছে প্রতিবাদ। কখনো ফেটে পড়েছে ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাসাহাসিতে।

একেবারে গোড়ার দিকে এ-সব ছড়া তৈরি হয়েছে অন্য কারণে। তখনও খবরের কাগজের চল হয় নি। কলকাতার এ পাড়ায় কার বাড়িতে কি ঘটল সে-খবর অন্য পাড়ার লোকের পক্ষে জেনে ওঠা সম্ভব ছিলনা তখুনি। ছড়াই পুরিয়ে দিত মাঝখানের ঐ ফাঁকটা। ছড়ার পিঠে চেপে এখানকার খবর ছুটতো ওখানে। হয়তো আবার কলকাতা পেরিয়েও চলে যেত দূর দূরান্তের নগরে-গঞ্জে-গ্রামে। সাদা-মাঠা বা সোজা-সাপ্টা বাক্যের চেয়ে ছন্দের ক্ষমতার জোরটা ঐখানেই। ছন্দর জোরেই সেটা একদিকে যেমন গাঁথা হয়ে যায় স্মৃতিতে, মুখস্থ হয়ে যায় আদি-অন্ত, তেমনি ছন্দে গাঁথা কোনো শ্লোকের মত বাক্য উচ্চারণ করলেই সেটা পেয়ে যায় ভুল-ভ্রান্তিহীন সত্যের চেহারা। পরে যখন কলকাতা শহরে খবরের কাগজের চল হল, তখুনিই যে ছড়া-রচনার অভ্যেসটা চলে গেল তা নয়। ওটা তখন চলে এসেছে স্বভাবের মধ্যে। ছড়া কাটা চলেছে তখন কাগজে-কাগজেও।

পুরনোকালের কলকাতায় শুধু যে ছড়াই ছিল সাধারণ অধিবাসীদের মনের মুখপাত্র, তা কিন্তু নয়। ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, ছড়ারই ঈষৎ উষ্ণ সংস্করণ, এক ধরনের গান। গাইতো শহরের কবিয়ালরা। গাওয়া হতো উৎসবে-অনুষ্ঠানে। প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে চড়কের মেলায় সং বেরত কলকাতায়। তখন শহরে ঘটে-যাওয়া সারা বছরের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীকে নিয়ে বানানো হতো গান। সং-এর দল নেচে-গেয়ে শুনিয়ে বেড়াতো সারা শহরে।

পুরনো কলকাতায় কবিয়াল ছিল অনেক। তার মধ্যে একজন খুবই বিখ্যাত। ধীরাজ কবিয়াল। এখুনি যা ঘটল তাই নিয়ে তখুনি গান লিখে গেয়ে শোনানোয় তাঁর ছিল দারুণ দক্ষতা। ঐ সব গানের মধ্যে দিয়েই তাঁর সমাজ-সমালোচনা। 'সংবাদ প্রভাকর' কাগজে ঈশ্বর গুপ্ত যেমন সমাজের অসঙ্গতিময় ঘটনাবলীকে নিয়ে লিখতেন ঠাট্টা- বিদ্রূপের কবিতা, ধীরাজ কবিয়াল সেইভাবেই লিখতেন তাঁর গান।

কলকাতায় তখন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর যুগ। ঐ গোষ্ঠীর ছাত্ররা প্রায় সকলেই মদ্যপান করত তখন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' বইয়ে

খোলাখুলি লেখাও আছে সেসব কথা। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কাছ থেকে সাহস পেয়ে মদ্যপানের নেশাটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সমাজের আরও ভিতরে। তার বাড়াবাড়ি দেখেই আস্তে আস্তে শহরে দানা বাঁধতে লাগল মদ্যপান-বিরোধী জনমত। অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার এক সময়ে হয়ে উঠলেন এই আন্দোলনের নেতা। মাতালদের ধরে ধরে সই করাতে লাগলেন প্রতিজ্ঞাপত্রে যে, আর কখনো হাত ছোঁয়াবে না মদের গেলাসে। প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করার পর সত্যি সত্যিই মদ খাওয়ার অভ্যেসটা ছেড়ে দিলেন অনেকে। কিন্তু ক্রমে জানাজানি হতে লাগল যে, যাঁরা মদ খাওয়া ছেড়েছেন, তাঁদের অনেকেই ধরেছেন মদের বদলে গাঁজা। এটা চোখে দেখে অথবা কানে শুনতে শুনতেই ধীরাজ কবিয়াল একদিন লিখে ফেললেন একটা গান, যার প্রথম দুটো পংক্তি হল—

মধুপান আর কোরো না
Young Bengal বাঁচবে না।

আর ঐ গানের শেষের পংক্তিতেই গাঁজা-খাওয়ার সমাচার আর তা নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা।

কিন্তু ড্যা-ঙ-গা-প-থে-নাইকো মানা।

ধীরাজ কবিয়াল যখন এই গান গেয়ে চলেছিলেন কলকাতার পথেঘাটে একদিন তার শ্রোতা হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল সেকালের নামজাদা পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের। ঐ দিনের ঘটনার কথা জানিয়েগেছেন তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায়। "ঐ 'ড্যা-ঙ্গা-প-থে-যে নাইকো মানা' চরণটি গাহিবার সময় ধীরাজ হেলিয়া দুলিয়া Pantomime-এর মত স্বহস্তে গঞ্জিকা মর্দনের অনুকরণ করিয়া হাসির ফোয়ারা ছটাইয়া দিত।"

কবিয়ালদের লেখা আর গাওয়া এই সব গান থেকে খুঁটে-নেওয়া টুকরো টাকরাও কখনো কখনো হয়ে উঠেছে মুখে মুখে ছড়াবার মুখরোচক ছড়া। যেমন হয়েছে পত্র-পত্রিকায় ছেপে-বেরনো কবিতার অংশবিশেষও। এ বইয়েই নমুনা আছে সে সবেরও।

আবার এমন নয় যে ছড়া লিখেছে কেবল কলকাতার বাঙালী অধিবাসীরাই। কলকাতাকে নিয়ে, কলকাতায় বসে বানানো এমন অজস্র ছড়া আছে যার রচয়িতা কলকাতায় নবাগত হিন্দুস্থানী সম্প্রদায়ের মানুষজন।

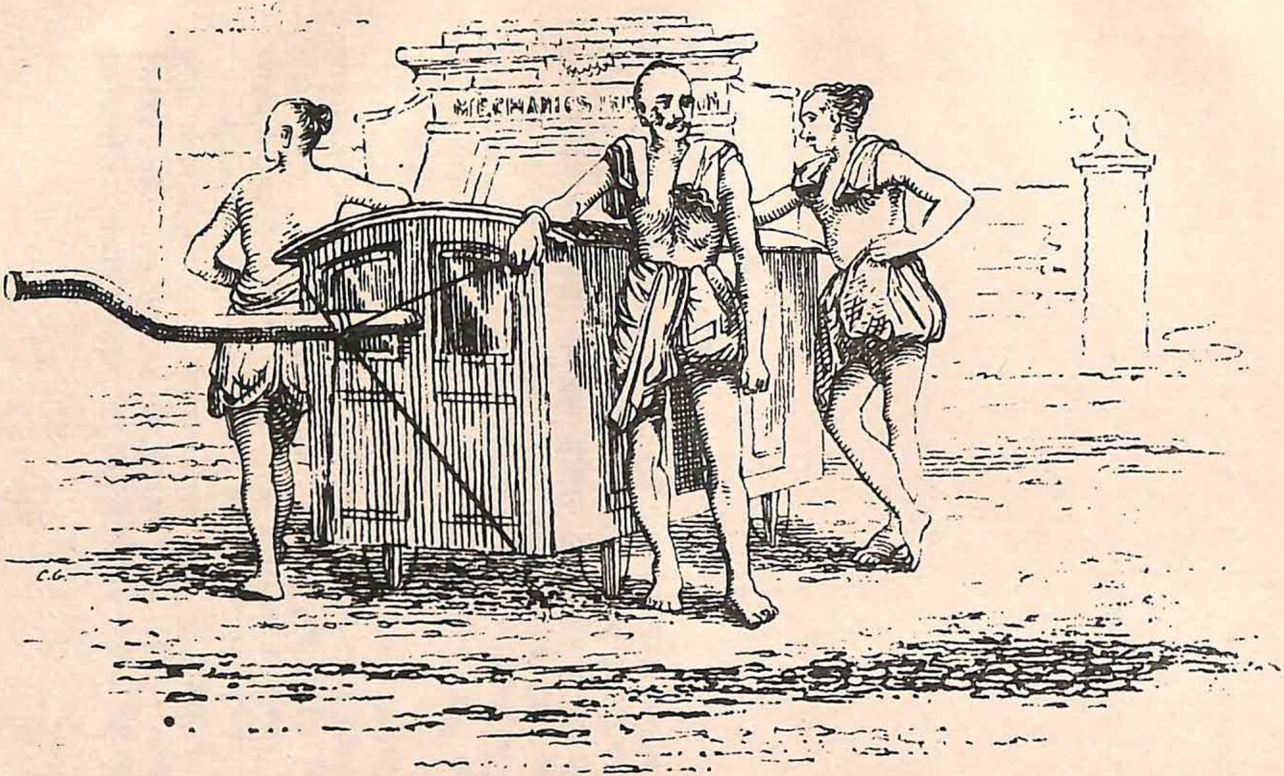
এই ছোট্ট বইয়ে পুরনো কলকাতার ছড়াগুলোকে সংগ্রহ করাটাই কিন্তু

আসল অভিপ্রায় নয়। ঐ সব ছড়ার সঙ্গে গাছের গায়ে বাকলের মত জড়িয়ে রয়েছে সমসাময়িক যে-সব ইতিহাস, তার অনুসন্ধান আর উন্মোচনটাই আসল। আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে বেরিয়েছিল এ বইয়ের প্রথম সংস্করণ। ১৯৮৩-তে ছাপা সপ্তম মুদ্রণ শেষ হওয়ার পর প্রকাশক বদল।

নতুন দে'জ সংস্করণে এই ভূমিকাটুকু ছাড়াও সংযোজিত হল আরো কয়েকটি নতুন ছড়া, তার জন্মকাহিনীসহ। সেই সঙ্গে বদলালো প্রচ্ছদ আর বাড়ল ভিতরের ছবি।

এ বই ছোটদের কথা মনে রেখেই লেখা। তাদের পড়তে ভালো লাগলেই আমার আনন্দ।

পূর্ণেন্দু পত্রী
সল্টলেক সিটি



সেকালের পালকি বেয়ারা

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকেতায় আছি।

কী করে কলকাতা হলো, সে তো তোমরা জেনেছো। ছিল এঁদো জমি, হোগলার বন, বুনো জানোয়ারের আড়ত, আর চোর-ডাকাতের আড্ডা। বনবাদাড় কেটে, খানাখন্দ বুজিয়ে, ঝোপ-ঝাড় কুপিয়ে, সাপ-খোপ মেরে, বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে একটু একটু করে মানুষের বাস। খড়ের চাল, মাটির বাড়ি, তারপর দেউড়ি-দালান, দোকানপাট, পুকুর-ঘাট, গ্যাসের বাতি, কলের জল, পাল্কি-ফিটন, এমনি একটু একটু করে বাড়তে বাড়তেই কলকাতা শহর।

মানুষের তাড়া খেয়ে, সাড়া পেয়ে চোর-ডাকাত আর ডাকাবুকো জন্তুজানোয়ারের দল শহরের চৌহদ্দী ছেড়ে পগার পার। রয়ে গেল কেবল দুটো জীব। মশা আর মাছি। আকারে চুনোপুঁটি। কিন্তু আক্রমণে যেন চেঙ্গীস খাঁ। সারা শহর তাদের ভয়ে তটস্থ।

কাঁচড়াপাড়ার ছেলে ঈশ্বর গুপ্ত। তখনো গুপ্তকবি হননি। তবে গ্রাম্য কবিয়ালদের সঙ্গে মেলামেশা থেকে মুখে মুখে ছড়া বা গান লিখতে পটু। ঈশ্বর গুপ্ত কাঁচড়াপাড়া থেকে বেড়াতে এসেছেন জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়িতে। শহর দেখে মুগ্ধ। আহা! কত আলো,

এমিলি ইডেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন। যাঁর নামে নাম এবং যাঁর উদ্যমে গড়া আজকের এই ইডেন উদ্যান।

কালীঘাট কালী হল চৌধুরী সম্পত্তি
হালদার পূজক তাঁর এই তো বৃত্তি।

চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী। বাদশা আকবরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন জমিদারি। আর মানসিংহের কাছ থেকে এই 'চৌধুরী' উপাধি। জমিদারির এলাকা ছিল দক্ষিণে বেহালা থেকে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। এরই মাঝখানে তিনটে গ্রাম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা। লক্ষ্মীকান্তের বংশধর কেশব রায় বাদশার কাছ থেকে পরে আবার উপাধি পেলেন 'রায়চৌধুরী'। গোত্র সাবর্ণ। সেই থেকে বংশের নাম সাবর্ণ রায়চৌধুরী।

এঁদের জমিদারির মধ্যেই কালীঘাট। বুড়িগঙ্গার তীরে, এঁরাই প্রতিষ্ঠাতা কালীঘাটের কালী মন্দিরের। সামাজিক নিয়মে বাধে বলে নিজেরা পূজা করতে পারেন না। তাই দূর দেশ থেকে ডেকে আনা হলো হালদার গোষ্ঠীয় ব্রাহ্মণ। সেই থেকে ঐ হালদারেরাই মন্দিরের সেবাইত। মন্দির যখন পত্তন হয়, চৌরঙ্গী আজকের মত আলো-ঝলমল ছিল না। ছিল ঘন গভীর জঙ্গল। ঐ জঙ্গলে বাস করতো এক খোঁড়া সাধু। নাম চৌরঙ্গীনাথ। সেই খোঁড়া সাধুই নাকি একদিন মাটি খুঁড়ে পেয়ে গেল এক প্রতিমা। সাবর্ণ চৌধুরীরা সেই প্রতিমাকেই প্রতিষ্ঠা করলেন—মন্দির গড়ে।

এখনকার এই লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারি। গোটা তল্লাটের মধ্যে পাকা বাড়ি ঐ একটাই। চৌধুরীদের কুলদেবতা হচ্ছেন শ্যাম রায়। দোলের দিনে খুব ঘটা করে উৎসব হতো মন্দিরে। আবিরে আবিরে লাল হয়ে যেত পুকুরের জল। সেই থেকে নাম হয়ে গেল, লালদীঘি। কেউ বলে, তা নয়। লালদীঘির গায়েই তো এক সময়ে ছিল পুরনো ফোর্ট উইলিয়ম। তারই লাল ছায়া পড়তো পুকুরের জলে। তাই দেখে, লালদীঘি। ১৬৯৮। সেদিন

কত বাড়ি, কত গাড়িঘোড়া। বাড়িতে বাড়িতে বাগান। বাগানে কত ফুল। বাড়িতে বাড়িতে যত ছাদ, তাতে বুলবুলি আর পায়রা নিয়ে খেলা। কিন্তু দু-দিন যেতে-না-যেতেই চোখ উঠলো কপালে। মাছির উপদ্রবে কাত। মশার কামড়ে কাতর। আর সেই সময়েই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল তখ্‌নি-বানানো এই ছড়া। আর সেই থেকেই তাঁর বেদনা আজও কলকাতায় বেদবাক্য হয়ে রয়েছে। যতদিন কলকাতা থাকবে, গুপ্তকবির এই অমর ছড়াটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মশা এবং মাছি দুই-ই থাকবে কলকাতায়, মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ে শুঁড় উঁচিয়ে।

সাহেবরা কলকাতার কালা আদমীদের ভয় পায়নি কোনদিন। কিন্তু ভয়ে কাঁপতো কালাজ্বর বা পাক্কাজ্বরের নাম শুনলে। ইংরেজ-দের ভাষায় ব্ল্যাক ফিভার। কলকাতার সেই আদি যুগে শ'য়ে শ'য়ে ইংরেজ মরেছে ম্যালেরিয়ায়। ১৭০০ সালের কথা। ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন হিসেব দিয়েছিলেন, ঐ সময়ে কলকাতায় সাহেবের সংখ্যা ছিল ১২০০। এক বছরেই পাক্কা জ্বরে মারা যায় ৪৬০ জন।

একজন ইংরেজ কবি, নাম এ্যাটকিনসন, সেই ভয়াবহ সময়ের ছবি এঁকে গেছেন তাঁর এক কবিতায়। সহজ ভাষায় সে কবিতার অর্থ হলো—'হে কলিকাতে! তোমার অবস্থা অতীতে কী খারাপই না ছিল। কত কষ্টেই না বাঁচতে হয়েছে তোমাকে। তোমার সারা শরীর জড়িয়ে ছিল ঘন জঙ্গল আর পচা জলাশয়। উঁচু উঁচু গাছগুলো আড়াল করে রাখতো আলো। সোঁদা মাটি থেকে উপচে উঠতো বিষের মত বাষ্প। দিনের তাপ আর রাতের ঠান্ডায় ঘরে ঘরে তখন বিছানা পাতা থাকতো জ্বরের। আজ সন্ধ্যেবেলা যে-সব পথিকেরা ঘুরে বেড়িয়েছে পথে, কাল সকালে তাদের দেহ ঠাঁই পেয়েছে কবরে।'

গুপ্ত কবির এই ছড়া লেখার প্রায় কাছাকাছি সময়েই কল-কাতায় বেড়াতে এসেছিলেন এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা। নাম ফ্যানী পার্কস। ১৮২২ সালের কথা। তাঁর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত সেকালের কলকাতার দলিলের মত। তাতে কলকাতার আমোদ-উৎসব, আচার-বিচার, চাল-চলন সব কিছুই আছে। এবং মশার কামড়ও। আর সেই সঙ্গে চুলকানির জ্বালাটাও। আরেকজন বিখ্যাত ইংরেজ মহিলার আত্মকথা পড়লে জানা যায়, তাঁর কলকাতাবাসের দিনগুলো কী দুর্দশাতেই না কেটেছে এই মশা আর মাছির উৎপাতে। তিনি শ্রীমতী

ছিল নভেম্বরের ১০ তারিখ। ইংরেজরা ঐ সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকেই কিনে নিলে তিনটে গ্রাম। সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা। কত দাম দিয়ে জানো? মাত্র তেরোশো টাকায়। সেই তেরোশো টাকায় তিনটে ক্ষুদে গ্রাম থেকেই আজকের এই এত বড় কলকাতা।

একবার খেলে হিজলী পানি
যমে মানুষে টানাটানি।

হিজলী যদি স্বাস্থ্যকর জায়গা হতো, যদি সুস্বাদু হতো তার জল, তাহলে কলকাতা তৈরি হতো না কোনদিন।

শায়েস্তা খাঁর দাপটে অস্থির হয়ে হুগলী ছেড়ে পালাতে হয়েছিল জব চার্নককে। হুগলীতে বসে তিনি কেল্লা বানাতে চেয়েছিলেন। কোম্পানী সায় দেয়নি। তারা বললে, এত তাড়াতাড়ি কিছু দরকার নেই। সরকার চটলে সমূহ বিপদ। বরং আশপাশে যেখানে যত ইংরেজ আছে, জড়ো করো হুগলীতে। তাই হচ্ছিল। শায়েস্তা খাঁর কানে গেল খবরটা। অমনি জ্বলে উঠলো কামান। চার্নক হুগলীর পাট গুটিয়ে পালাতে লাগলেন। কিন্তু পালিয়ে তো যেতে হবে কোথাও! পথে পড়লো সুতানুটি। খড়ে ছাওয়া দু'চারটে মাটির ঘর। একটা হাট। সামান্য কিছু লোকের বাস। মাসখানেক রয়ে গেলেন সেখানে। কিন্তু মন বসলো না। আবার জায়গা খোঁজা। খুঁজতে খুঁজতে হিজলী। জায়গাটায় শস্য হয় প্রচুর। সমুদ্র কাছে বলে নুন তৈরি হয় পর্যাপ্ত। নুনের ব্যবসা মোগলদের একচেটে। এখানে থাকলে নুনের ব্যবসাটা জমবে। তা ছাড়া জায়গাটা চারদিক দিয়ে ঘেরা। হুগলী থেকে চট করে ছুটে এসে শায়েস্তা খাঁ আক্রমণ করবে সে ভয় নেই। ভাবনা নেই বলেই ইংরেজরা যেন সাপের পাঁচ পা দেখলে। বালেশ্বরে নবাবের যে দুর্গ, ইংরেজরা দখল করে নিলে সেটা। একদিন নদীপথে জাহাজে চলেছে চারটে হাতি। দুটো নবাব শায়েস্তা খাঁর। দুটো শাহজাদার। জাহাজ আক্রমণ করে কেড়ে নিলে সেগুলো।

শায়েস্তা খাঁর কানে এল এ খবর। শোনামাত্রই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। মালেক কাশেম খাঁকে ডেকে বললেন, ইংরেজের বাচ্চাগুলো হিজলীতে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। একদম খেদিয়ে সাগর পার করে দিয়ে এস তো। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আবার। প্রথম দিকে সাহেবদের জিত। নবাবী ফৌজ বেসামাল। কিন্তু পরে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছেড়ে ইংরেজরা পালাতে লাগলো হিজলী ছেড়ে, সমুদ্রের দিকে।

হিজলী যদি স্বাস্থ্যকর জায়গা হতো, যদি সুস্বাদু হতো তার জল, ইংরেজরা সেবার হারতো না, পালাতো না জাহাজে চেপে। হিজলীর জলে ছিল বিষ। খেলেই ম্যালেরিয়া। যে বছরের কথা সে বছর মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে হিজলীতে মড়ক। শ'য়ে শ'য়ে লোক মরছে দু'বেলা। ইংরেজদের অর্ধেক কুলি-মজুর, সেপাই-সান্ত্রী 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' রব তুলে পালিয়ে গেছে যেদিকে দু' চোখ যায়। যারা ছিল, তাদের অর্ধেকের হাত পা জ্বরে ভুগে পাকাটি। এই নিয়ে কী যুদ্ধে জেতা যায়? যুদ্ধ থামতেই, চার্নক ঠিক করলেন আর হিজলীতে নয়। নৌকোয় চেপে পাড়ি দিলেন সুতানুটির দিকে। অবশ্য তখুনি তখুনি তাঁর জানা ছিল না যে, আসলে তিনি গড়তে চলেছেন কলকাতা নামে এক শহর।

পিরালী, কায়েত, তাঁতী আর সোনার বেনে,
করলে আবাদ তারা দেশ বয়ে ধন এনে।

এই ছড়ার মধ্যে হদিশ রয়েছে, সেই আদ্দি যুগে, যখন সুতানুটি কলকাতা আর গোবিন্দপুর তিনে মিলে কলকাতা হয়নি, তখন ইংরেজদের সঙ্গে যারা ব্যবসা করতো, কলকাতার সেই সব প্রাচীন বাসিন্দেদের। গ্রাম কলকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর। গায়েই গঙ্গা। সেখানে এসে থামে ইংরেজদের জাহাজ। গোবিন্দপুরে তখন শেঠ, বসাকদের বাস। বণিক বলতে তারাই। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসার সূত্রে খাতির বলতে তাদেরই। নিজেদের গ্রাম বারোপাড়া ছেড়ে

একঘর পিরালী বামুন গোবিন্দপুরে চলে এসেছিল লক্ষ্মীর খোঁজে। পঞ্চানন কুশারী সেই বংশের ছেলে। তাঁর কাজ ছিল ইংরেজদের জাহাজে মালপত্র ওঠানো নামানো, তাদের খাবারদাবার জোগাড় করে দেওয়া। একা করার কাজ নয়। এর জন্যে বেশ কিছু কর্মচারী রাখতে হয়েছিল তাঁকে। কর্মচারীরা সমাজের নীচুতলার লোক। তারা তাদের ব্রাহ্মণ প্রভু পঞ্চাননকে কি নামে ডাকবে? ভেবেচিন্তে নিজেরাই ঠিক করে নিলে, ডাকবে ঠাকুর মশাই। তারপর কুলী-মজুর থেকে জাহাজের কাপ্তেন সকলের মুখে পঞ্চানন কুশারী হয়ে গেলেন পঞ্চানন ঠাকুর। কাগজে-কলমে জন্ম নিল নতুন পদবী—ঠাকুর।

পিরালী বামুন বলতে তখন কা'দের বোঝাতো জানো? এই নিয়ে যে কিংবদন্তী আছে, সেটাই শোনাই। বাংলাদেশ তখন তুর্কীদের দখলে। কেউ চাকরীর লোভে, কেউ ঐশ্বর্যের লোভে, কেউ কেউ তুর্কী মেয়েদের লোভে মুসলমান হতে লাগলো। এইভাবে যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে গেল তাদের মধ্যে নানা থাক্—কেউ সেরখানী, কেউ পিরালী, কেউ শ্রীমন্তখানী।

নবদ্বীপে পিরল্যা বা পিরালিয়া নামে ছিল একটা গ্রাম। সেখানে তাহের নামে বাস করতো এক মুসলমান। আগে ছিল হিন্দু। সেই তাহেরকে লোকে ডাকতো পীরআলি বলে। তাহের ছিল খান্ জাহানের দেওয়ান। তখন এই তাহেরের অত্যাচারে একদল লোক হিন্দু থেকে মুসলমান হয়। পুরনো মঙ্গলকাব্যে তার বিবরণ লেখা আছে—

> পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
> উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
> কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে
> ঘর দ্বার লোটে আর লৌহ পাশে বাঁধে।

পিরল্যা গ্রামের যেসব হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল, তারাই পিরালী ব্রাহ্মণ। গোবিন্দপুরের পঞ্চানন ঠাকুর সেইরকম এক পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই ছেলে। জয়রাম আর রামসন্তোষ। ১৭৪২ সালে কলকাতায় যখন জরীপের কাজ শুরু হয়, তখন এঁরা দুজন চাকরী পেয়ে গেলেন আমিনের। সেই সময় থেকেই এঁদের সংসারে লক্ষ্মীর আনাগোনা।

সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করলেন, তখন শহরের

অনেক ক্ষতি হয়। পলাশীর যুদ্ধ মিটে গেলে মীরজাফর ইংরেজদের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেন। ড্রেক সাহেব জয়রামের ছেলেদের হাতে সেই সময় ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছিলেন প্রায় ছ' হাজারের মত।

জয়রাম ঠাকুরের তিন ছেলে। নীলমণি, দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম। কিন্তু তিন ভাই এরপর উঠে এলেন পাথুরেঘাটায়, জমি কিনে। কিন্তু এক সংসারে তিনজন বেশীদিন থাকতে পারলেন না। ভায়ে ভায়ে বিবাদ। নীলমণি ঠাকুর, জয়রামের মেজো ছেলে, ১ লক্ষ টাকায় দর্পনারায়ণকে পাথুরেঘাটার বাড়িঘর বেচে দিয়ে চলে এলেন জোড়াসাঁকোয়। বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে ১ বিঘে জমি কিনে নতুন করে পাতলেন নিজের সংসার। ১৭৮৪ সাল সেটা। আজকের বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জন্ম সেই থেকে।

চার্নকের সময়ে কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দেদের মধ্যে সবার আগে শেঠ আর বসাক। কুড়ুল দিয়ে গাছ, কোদাল দিয়ে মাটি আর কাটারী দিয়ে হোগলা বন কেটে তাঁরা বানিয়েছিলেন বসবাসের জমি। সেকালে তাই তাঁদের বলা হতো 'জঙ্গল কাটা বাসিন্দে'। সুতো বেচাই ছিল তাঁদের আসল ব্যবসা। বরানগরের তাঁতীদের দাদন দিয়ে সুতো কাটিয়ে তাঁরা ব্যবসা করতেন বলে, সমাজে আরও একটা পরিচয় ছিল, 'দাদনি বণিক'। কলকাতায় শেঠেদের একটা বাগান ছিল ১১০ বিঘের মত। এবং তাঁরাই যেহেতু কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে, কোম্পানী তাঁদের উপরেই ভার দিয়েছিলেন, তাঁদের এলাকার রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার। এর জন্যে কোম্পানী তাঁদের খাজনাও মকুব করে দিয়েছিলেন কিছুটা। শেঠেদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণবচরণ শেঠের ছিল গঙ্গাজলের ব্যবসা। শিলমোহর করা এই গঙ্গাজল চালান যেত দেশবিদেশে।

এই শেঠ পরিবারের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজনের নাম—বারানসী, জয়কৃষ্ণ, গোলাপ এবং যদু। বসাক পরিবারের মধ্যে তখন বিখ্যাত ছিলেন শোভারাম। কোম্পানীর দালালি করেই এ'দের বড়মানুষি। তখন কোম্পানী কাউকে দালালি পদে নতুন নিয়োগ করার সময় উপহার দিত এক বোতল গোলাপজল, পান আর শিরোপা। দালালরা কমিশন পেত সামান্য। টাকায় আধ পয়সা। কিন্তু উপরি আয়ের চোরাপথ খোলা ছিল অনেক।

সোনার বেনে মানে সুবর্ণবণিক। পুরনো কলকাতার সঙ্গে এঁদের একজনের নাম জড়িয়ে আছে খুব ঘনিষ্ঠের মত। তিনি রাজারাম মল্লিক। এক সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার বোলবোলাও দেখে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ঐরকম আরো একটা কোম্পানী। দুই কোম্পানীর মধ্যে ব্যবসা নিয়ে নিত্যদিন বাদবিবাদ। হুগলীতে যখন শায়েস্তা খাঁর দাপটে ইংরেজের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা টলোমলো, সেই সময়ে এই রাজারামের পরামর্শেই চার্নক কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এবং এই রাজারামের দূত-গিরিতেই দুই কোম্পানী এক হয়ে যায় মিলেমিশে। কোম্পানীর জমিদারিতে রাজারাম বড়বাজার অঞ্চলে বাস করতেন বিনা খাজনায়। রাজারামের দুই ছেলে—দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ। কলকাতার সন্তোষের বাজার তাঁরই নামে নাম। বিখ্যাত নিমাইচরণ মল্লিক এই পরিবারের ছেলে। চলতি নাম নিমু মল্লিক। অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। নিমাইচরণের সাত ছেলে। ছেলেয় ছেলেয় মামলা। শুধু সেই মামলা চালাতেই খরচ হয়ে গেল ৬ লাখ টাকা। নিমাইচরণের বাড়িতে যে দুর্গোৎসব হতো, সে এক এলাহি কাণ্ড।

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি
জগৎশেঠের কড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি।

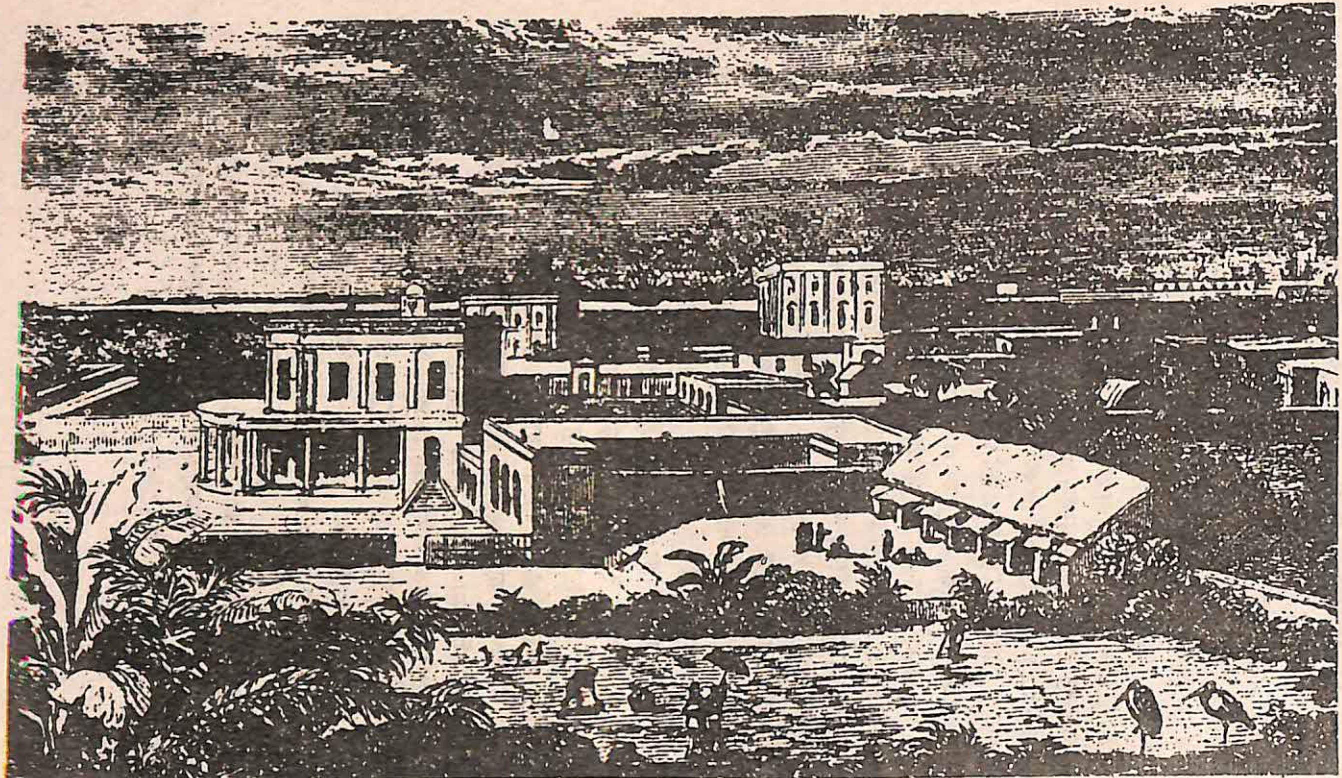
এ ছড়ার আরও অনেক রকম-ফের আছে। কোনটাতে গোবিন্দ মিত্রের জায়গায় নন্দরাম সেন। কোনটাতে জগৎশেঠের জায়গায় নকু ধর। নাম-হাঁকানো এই ছড়ার সব ক'টি ব্যক্তিই তখনকার কালের খুব নামজাদা।

বনমালী সরকার প্রথমে ছিলেন পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্সীর দেওয়ান। তারপর হলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটী ট্রেজারার। ব্যবসা থেকে আসে প্রচুর টাকা। দেখতে দেখতে টাকার কুমির।

তারপরেই কুমোরটুলিতে বাড়ি। বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ। রাজপ্রাসাদ। আট-দশ বছর ধরে তৈরি। ভেতরে এলাহি ব্যাপার। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে জোগাড় করা যত রাজ্যের দামী দামী শৌখিন জিনিসে ঘর-দালান বোঝাই। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দূর দেশ থেকে কেউ বেড়াতে এসেছে কলকাতায়, কি পুজো দিতে এসেছে কালীবাড়িতে, তার একবার বনমালী সরকারের বাড়িতে উঁকি দিয়ে যাওয়া চাই। যারা সে সুযোগ পায় না, তারা যেন কী এক সুখ হারালো। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কী নামডাক তখন তাঁর! কত না ঐশ্বর্য, কত ধনরত্ন, জাঁকজমক। তিনি পর্যন্ত একদিন ছুটে এলেন কলকাতায়। সঙ্গে বয়স্য গোপাল ভাঁড়। তাঁর মত মানুষের চোখেও সে-বাড়ির তারিফ। হ্যাঁ, দেখবার মত জিনিসই বানিয়েছে বটে! বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী ছিল এই বনমালী সরকারেরই প্রতিষ্ঠা করা।

গোবিন্দরাম মিত্র গোড়া থেকেই খুব বড় ঘরের ছেলে। গ্রামের নাম চানক। ব্যবসায় টাকা করার বাসনায় চানক ছেড়ে একদিন চলে এলেন চার্নকের গড়া কলকাতায়। কলকাতায় এসেই জুটে গেল চাকরী। হলওয়েল নামে এক সাহেব তখন কলকাতার কালেকটার। বাংলায় বলা হতো জমিদার। গোবিন্দরাম চাকরী পেলেন তাঁরই অধীনে। ব্ল্যাক জমিদার। কিছুদিন চাকরী করতে না করতেই জানা হয়ে গেল অন্ধিসন্ধি, রাতারাতি বড়লোক বনে যাওয়ার। তারপরেই শুরু হয়ে গেল গাড়ি হাঁকানো, বাড়ি বানানো। ব্যবসা চললো স্বনামে বেনামে। টাকার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগলো খ্যাতি। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ-প্রতিপত্তি। গোবিন্দরামের তখন এমন দাপট, লোকে বলতো, বাঘে বলদে জল খেতো এক ঘাটে। সব সময় হাতে তেল-চকচকে সোনা বাঁধানো ছড়ি। সেই যেন তাঁর শাসনদন্ড।

কুমোরটুলীতে ছিল তাঁর অট্টালিকা। অট্টালিকার সঙ্গে মন্দির। নবরত্ন মন্দির। ন'টা চুড়ো। লম্বায় মনুমেণ্টের চেয়ে উঁচু। ১৬৫ ফুট গড়া হয়েছিল ১৭২৫ সালে। ১৭৩৭-এর ঝড়ে একবার ভেঙে ছিল অনেকগুলো চুড়ো। ১৮৪০-এর ভূমিকম্পে সবটাই গুঁড়ো। উপর-ওয়ালাদের উপরেও ছড়ি ঘোরাতে ছাড়েননি তিনি। হলওয়েল চিরদিনই গোবিন্দরামের উপর গোসা। হয়তো আসল কারণটা এই, হলওয়েল বুঝে গিয়েছিলেন, সাহেবদের ঠকিয়ে, কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে লোকটা টাকা কামাচ্ছে।



কলকাতার পুরনো গ্রামে নতুন শহর।

একবার হলো কি, হলওয়েল সাহেব জমিদারি সেরেস্তা সংক্রান্ত যত কিছু হিসেব-নিকেশের কাগজ চেয়ে পাঠালেন গোবিন্দরামের কাছে। যে পত্রবাহক সাহেবের হুকুমনামা নিয়ে এসেছিল, গোবিন্দরাম তার হাতে হিসেব-নিকেশের কাগজের বদলে ধরিয়ে দিলেন একটা চিঠি। তাতে লেখা, আমরা দু'জনেই কোম্পানীর চাকুরে। মাইনে পাই, কাজ করি। প্রেসিডেণ্টের অনুমতি ছাড়া আপনাকে হিসেব-নিকেশের ছিটেফোঁটাও দেখাতে পারবো না। হলওয়েল চিঠি পড়ে হতভম্ব। তবে হতোদ্যম নন। পলাশীর যুদ্ধ তখনো হয়নি। বছর পাঁচেক বাকি। সেই সময়ে হলওয়েল হাতেনাতে ধরে ফেললেন গোবিন্দরামকে। কোম্পানীর কাছে খাতাপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করলেন, গোবিন্দরাম কোম্পানীর তফিল থেকে টাকা সরিয়েছে।

তলব এল কোম্পানীর কাউন্সিল থেকে। গোবিন্দরামের কিন্তু এতটুকু ভয়-ডর নেই। কাউন্সিলের সামনে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি উত্তর দিলেন, আমি তো নতুন কিছু করিনি। আমার আগে যাঁরা এই চাকরী করে গেছেন, তাঁদের চেয়ে আমি তো অন্য কোন কিছু করিনি। আমার মত একজন মোটা মাইনের কর্মচারীর পক্ষে যে পরিমাণ লোকজন দাসদাসী সাজ-সরঞ্জাম জাঁকজমক থাকা দরকার, আমার তো তার কিছুই নেই। কোম্পানী যা মাইনে দেয়, তাতে কোনমতে সংসার চললেও, সম্মান বাঁচানো চলে না। অতএব...। কোম্পানী তো জবাব শুনে বোবা। এই হলেন গোবিন্দরাম মিত্র। ছড়ি শুধু তার হাতে নয়, বুদ্ধিতেও।

জগৎ শেঠ, জগৎ শেঠ সবাই বলি, কিন্তু ওটা নাম নয়, উপাধি। আসল নাম ফতেচাঁদ। উপাধিটা দিয়েছিলেন দিল্লীর সম্রাট ফারুক-শিয়র। সম্রাট হবার আগে তিনি ছিলেন বাংলার নবাব। এবং গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছিলেন সিংহাসন দখলের জন্যে। সেই সময় ফতেচাঁদ বুদ্ধি দিয়ে, সাহস দিয়ে, টাকাপয়সা দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে-ছিলেন ফারুকশিয়রকে। যেদিন সত্যিই সম্রাট হলেন, সেদিনই ফতে-চাঁদকে ঐ উপাধি বিলোনো। উপাধির সঙ্গে উপঢৌকনও ছিল প্রচুর। সোনাদানা, ধনরত্নের সঙ্গে আরও একটা জিনিস। ফরমান। সেই ফরমানের জোরে তাঁর ঠাঁই হয়েছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের সিংহাসনের বাঁদিকে। মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন বাংলার বহুদিনের দেওয়ান। তারপর হলেন নবাব। তার পিছনেও অনেকখানি উমেদারী

কানাকড়িও ঠেকায়নি। জানিয়ে দিলে, ওটা জাল চুক্তিপত্র। সেই শোকে মাটিতে আছড়ে পড়ে গিয়েছিলেন উমিচাঁদ। তারপর থেকে বাকী জীবনটা কেটেছে অর্ধ উন্মাদ হয়ে।

নকু ধরের আসল নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। ধনকুবের বলতে যা বোঝায়, ইনি ছিলেন তাই-ই। হুগলী থেকে কলকাতার সুতানুটি এসে যখন থেকে বসবাস, সেই সময় থেকে কোম্পানীর সঙ্গে খুব খাতিরের সম্পর্ক। বিপদে পড়লেই কোম্পানী হাত পাতে নকু ধরের কাছে। পলাশী যুদ্ধের আগে ক্লাইভকে জুগিয়েছেন অনেক টাকা। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যেবার প্রথম যুদ্ধ বাধলো ইংরেজদের, সেবার এককালীন ৯ লক্ষ টাকা নকু ধর কর্জ দিয়েছিলেন ইংরেজদের। ক্লাইভ তাঁর কাছ থেকে যেটুকু উপকার পেয়েছিলেন, বিনিময়ে সেটুকু পুষিয়ে দিয়েছিলেন পলাশী যুদ্ধের পর। প্রচুর খেলাৎ, প্রচুর উপঢৌকন তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে।

সুখময় রায়, সেকালের নামজাদা ধনী, নকু ধরেরই দৌহিত্র। ক্লাইভ তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন রাজা। এই নকু ধরের দৌলতেই নবকৃষ্ণের সঙ্গে ইংরেজদের পরিচয়। তাঁর বংশ পোস্তার রাজবংশ নামে বিখ্যাত।

নন্দরাম সেন কলকাতার প্রথম কালা জমিদার। অর্থাৎ গোবিন্দরাম যে চাকরী করতেন, সেই চাকরীই। কলকাতার প্রথম যিনি জমিদার তাঁর নাম র‍্যালফ্ শেলডন। নন্দরামের চাকরী তাঁরই অধীনে। শেলডনের পর ঐ জমিদারের চাকরী পান বেঞ্জামিন বাউচার নামে আর এক সাহেব। প্রমোশন পেয়ে আরও বড় জায়গায় ঠাঁই পেলেন শেলডন। যাবার আগে নন্দরামকে শেলডন সাহেব তুলে দিয়ে গেলেন বাউচারের হাতে। বাউচার লোকটার ধাত ছিল খুব কড়া। কর্মচারীরা চুরি করে ফাঁক করছে কোম্পানীর টাকা, এই অভিযোগে বহুলোকের চাকরী খেয়েছিলেন তিনি। এমনকি নন্দরামেরও। তাঁর বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। তহবিল তছরুপ। নন্দরাম ছাঁটাই হলে, তাঁর জায়গায় এলেন জগৎ দাস। কিন্তু জগৎ দাসের পর আবার ঘুরেফিরে সেই নন্দরাম।

শেলডন খুব ভালবাসতেন নন্দরামকে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বেশ নিরাপদেই ছিলেন নন্দরাম। শেলডন মারা যাবার পরই দুর্ভোগের একশেষ। নন্দরাম আগেই আঁচ পেয়েছিলেন, বাউচার

ছিল জগৎ শেঠের। নবাবের পক্ষ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ভার পড়েছিল তাঁরই ঘাড়ে। তিনিই কোষাধ্যক্ষ। আবার তাঁরই বাড়ির উঠোনে টাকা তৈরির কারখানা। দু'শোজন অশ্বারোহী সৈন্য দু'বেলা পাহারা দিত তাঁর বাড়িঘর, ধন-ভাণ্ডার। রাজা-মহারাজা যাঁর যখন তহিল খালি, টাকার টান তখন ভরসা কেবল একজনই। তিনি জগৎ শেঠ। পলাশী যুদ্ধের পিছনে যে ক'জন বিশ্বাসঘাতকের সবচেয়ে খ্যাতি, জগৎ শেঠ তাদের মধ্যে একজন। সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার অভিপ্রায়ে মীরজাফরের ডাকে প্রথম যে গোপন সভা বসেছিল, তার স্থান ছিল ঐ জগৎ শেঠের বাড়িরই অন্দরমহল।

শেঠদের মধ্যে নামজাদা যেমন জগৎ শেঠ, বণিকদের মধ্যে তখন তেমনি উমিচাঁদ। আসল নামটা কি তা নিয়ে নানান মত। কেউ বলেন আমিরচাঁদ। কেউ আমিচাঁদ। আবার বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখে গেছেন উমাচরণ। কেউ লিখেছেন অমিচাঁদ। তবে উমিচাঁদ নামটারই বেশী চল। পশ্চিমের বণিক। ব্যবসা করতেই বাংলায় বাস। যেহেতু বাংলায় বাস, বিখ্যাত মেকলে সাহেব ভেবে নিয়েছিলেন, ইনি বুঝি বাঙালী। তাঁর বইয়ে উমিচাঁদের পরিচয় 'ধূর্ত বাঙালী'। তাঁর বাঙালী পরিচয়টা মিথ্যে বটে, তবে 'ধূর্ত' বিশেষণটা খাঁটি।

একেবারে গোড়ার যুগে ইংরেজরা এই উমিচাঁদের সাহায্য নিয়েই বাংলাদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ভিতরে নাক গলাতে পেরেছিল। তখন ইংরেজরা গ্রামে গ্রামে নগদ টাকা 'দাদন' দিয়ে পাট তুলো এসব কিনতো। কিনে বেচতো বাজারে। টাকায় টাকা লাভ। তাতে ভাগ ছিল উমিচাঁদেরও। গোড়ায় গোড়ায় তাঁকে খুবই তোয়াজ করেছে তাই ইংরেজরা। তারপর যখন ব্যবসাবাণিজ্যের আটঘাট সব জানা হয়ে গেল, উমিচাঁদ বাতিল। উমিচাঁদও তেমনি চতুর। একবার সিরাজউদ্দৌলাকে গিয়ে বলছে, ইংরেজদের আক্রমণ করুন। আবার ইংরেজদের কানে গিয়ে ফিসফাস, সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করতে এসেছে বটে, কিন্তু সৈন্যসামন্ত কামানবন্দুক সব পড়ে আছে পিছনে। সিরাজউদ্দৌলা যখন দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণ করতে এসেছিলেন, উঠেছিলেন হালসীবাগানে উমিচাঁদেরই বাগানবাড়িতে।

পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ যখন সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষ লুটপাট করে নিয়ে এলেন, তাতে উমিচাঁদের ভাগ ছিল। ভাগ থাকবে বলে চুক্তিপত্র লেখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাকে

সাহেব তাঁকে ঘোল খাওয়াবার চেষ্টা করবে প্রাণপণে। তাই তিনি আগেভাগেই পালিয়ে গেলেন হুগলীতে। কিন্তু পালিয়েও শান্তি নেই। কোম্পানীর পেয়াদা এসে হাজির হলো একদিন। হাতে নোটিশ—কোম্পানীর খাজনার যত টাকা সরিয়েছ, ফেল সেই সব কড়ি। কড়ি মিলল না। নন্দরামকে নৌকোয় চাপিয়ে টেনে আনা হলো কলকাতায়। সেখান থেকে সোজা হাজতে। তার পরের দিনই শহর জুড়ে ঢ্যাঁড়া পড়লো, নন্দরামের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক এখন থেকে কোম্পানী।

যম জিনিতে যায় রে চুড়ো
যম জিনিতে যায়।
জপতপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়।
সবাইকে ফেলে চুড়ো যম জিনিতে যায়
নবা তুই দেখবি যদি আয়।

ঢুলিরা বাজাচ্ছে ঢোল। পিছনে খোল কত্তাল। তার পিছনে অগুনতি লোকজন। তাদের মুখে এই ছড়া, গানের সুরে, তালে তালে। আর সব কিছুর আগেভাগে খাটের বিছানায় শুয়ে, চার বাহকের কাঁধে চেপে চূড়ামণি দত্ত চলেছেন গঙ্গার ঘাটের দিকে। না, স্নানে নয়। সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করতে। সেকালের ভাষায়, অন্তর্জলি যাত্রায়। চলেছেন কোন্‌খান দিয়ে ? না, রাজা নবকৃষ্ণের দেউড়ির সামনে দিয়ে। এর পিছনে যে কারণ, সেটা একদিনের নয়। নবকৃষ্ণের প্রতিবেশী হলেন চূড়ামণি দত্ত। নবকৃষ্ণ এক পুরুষে বড়লোক। চূড়ামণিরা বনেদী। দুটো পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। কে কখন কাকে ছোট করবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা, বছরের পর বছর।

চূড়ামণিদের চোখে নবকৃষ্ণ চিরদিনই ছোট। চোখের সামনে তারা বড় হতে দেখেছেন নবকৃষ্ণকে। বাবার নাম রামচরণ। বাড়ি ছিল কলকাতার গোবিন্দপুরে। ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ

বানানোর সময় ছেড়ে দিতে হয় সে জায়গা। তখন রামচরণ মারা গেছেন। নবকৃষ্ণের সংসারে তখন বিধবা মা, তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে। গোবিন্দপুরের বদলে কোম্পানী ক্ষতিপূরণস্বরূপ কয়েক হাজার টাকা আর জায়গা দিলে আড়পুলীতে। সে জায়গাটা পছন্দ হলো না। বেচে দিয়ে সবাই চলে এলেন শোভাবাজারে।

দুঃখকষ্টের সংসারে দিন কাটে কোনমতে। সবাই একটু একটু করে বড় হয়। নবকৃষ্ণের দুই দাদা, রামসুন্দর আর মানিক্যচন্দ্র চাকরী পেয়ে চলে যান দূর দেশে। মায়ের কাছে থেকে, মায়ের যত্নে ছোট নবকৃষ্ণ লেখাপড়া শেখেন। ছেলেবেলা থেকেই বাংলা আর ফারসী ভাষায় দখল। যখন ষোল বছর বয়স তখন ইংরেজী এবং আরবীটাও শেখা হয়ে গেছে। এই সময়ে লক্ষ্মীকান্ত ধর নামে একজন ধনকুবের বাস করতেন কলকাতার নতুন বাজারে। সুবর্ণবণিক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে টাকা ধার দিতেন বিপদে আপদে। ডাকনাম নকু ধর। নবকৃষ্ণ একদিন গিয়ে তাঁকে ধরলেন। আপনার সঙ্গে তো সাহেব-সুবোদের খুব মেলামেশা, আদর-খাতির। আমাকে একটা চাকরী পাইয়ে দিন না! নকু ধর চাকরী পাইয়ে দিলেন। হেস্টিংসের ফারসী ভাষার শিক্ষক। হেস্টিংস তখন কোম্পানীর সামান্য একজন কেরানী। নবকৃষ্ণের ছাত্র পড়িয়ে দিন কাটে। বেশ কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন ডাক পড়লো মুন্‌শী নবকৃষ্ণের, কোম্পানীর খোদ কর্তাদের দরবারে। কী ব্যাপার! না একটা গোপন চিঠি পড়ে দিতে হবে। কোম্পানীর নিজেদেরই তো মুন্‌শী ছিল মাইনে করা। তোজউদ্দীন খাঁ। তিনি বাতিল কেন? বাতিল, যেহেতু তিনি মুসলমান। গোপন চিঠির কথা হয়তো ফাঁস করে দিতে পারেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার কানে। কারণ চিঠিখানা যে তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের। লিখে পাঠিয়েছেন মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎ শেঠেরা একযোগে। নবকৃষ্ণ চিঠি পড়ে মানে বুঝিয়ে দিলেন। তারপরই ৬০ টাকা মাইনেতেই তিনি হয়ে গেলেন কোম্পানীর 'নব মুন্‌শী'। সিরাজউদ্দৌলা দ্বিতীয়বার এসেছেন কলকাতা আক্রমণে। ক্লাইভ তখন মাদ্রাজ থেকে চলে এসেছেন কলকাতায়। সিরাজের তাঁবু পড়েছে হালসীবাগানে, উমিচাঁদের বাড়িতে। পরাজিত ইংরেজ সিরাজের সঙ্গে সন্ধি করতে ব্যস্ত। সন্ধিপত্রের বাহক হয়ে নবকৃষ্ণ হালসীবাগানে হাজির। ফিরে এসেই গোপন খবর দিলেন ক্লাইভের কানে। নবাবের সৈন্যসংখ্যা কত। শক্তি

কতটা। ক্লাইভ সেই খবরের উপর নির্ভর করে সেই রাত্রেই হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো সিরাজকে। এই আক্রমণের ফলে নবাবকেও ঝুঁকতে হলো সন্ধি করার দিকে।

এর পরেই পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজের কোষাগার লুটপাট করে যা ছিল সব ভাগ করে নিলে ক্লাইভ এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডারা। কিন্তু সিরাজের গোপন একটা ধনাগারের খবর ইংরেজরা জানতো না। সেই টাকা মীরজাফরদের সঙ্গে ভাগ করে নিলে নবকৃষ্ণ। তার পরই এক রাতে কোটিপতি।

পলাশীর পর থেকে ক্লাইভ কোম্পানীর হর্তাকর্তা। ভাগ্যবিধাতা ভারতবর্ষের। শেষবারের মত যেবার চলে যাচ্ছেন ভারতবর্ষ ছেড়ে, দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে নবকৃষ্ণের জন্যে চেয়ে নিলেন একটা উপাধী। রাজা বাহাদুর। সেই সঙ্গে পাঁচ হাজারী মনসবদারী। তাঁকে দেওয়া হলো ৩০০০ অশ্বারোহী আর ঝালর দেওয়া পালকি রাখার অধিকার। পালকি তখন যে কেউ ইচ্ছে করলেই চড়তে পারতো না। তার জন্যে কোম্পানীর ছাড়পত্র চাই। তার এক বছর পরেই, ১৭৬৬ সালে আবার উপাধি। এবার 'মহারাজা বাহাদুর'। এবার করে দেওয়া হলো ছ'হাজারী মনসবদার। ৪০০০ অশ্বারোহী রাখার অধিকার। এই উপাধি দান উপলক্ষে ক্লাইভ দরবার বসিয়ে ফেললেন কলকাতায়। নবকৃষ্ণকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুলো রাজপথে। বাজনা-বাদ্যিতে কী ধুমধাম সেদিন! ধন্য ধন্য রব শহর জুড়ে। সেই ধন্য ধন্য রব আরো দ্বিগুণ হলো সেদিন, যেদিন কলকাতার লোক দেখলে একসময়ের ৬০ টাকা মাইনের মুন্শী মায়ের শ্রাদ্ধে খোলামকুচির মত খরচ করলে ৯ লক্ষ টাকা। চূড়ামণিরাও দেখেছিল এবং দেখতে হচ্ছিল বলেই তো এতটা জ্বালা! শেষ বয়সে খুবই দানধ্যান করতেন নবকৃষ্ণ। চূড়ামণিরা বলতো, ও তো চুরির টাকা, পাপের টাকা। যতই দানধ্যান, জপতপ করুক, সজ্ঞানে মরতে পারবে কি? চূড়ামণির পরিজন-পারিষদেরা পরম পরিতোষে সেই কথাটাই ঢাক-ঢোল খোল-কত্তাল বাজিয়ে নবকৃষ্ণের কানে পৌঁছে দেবার জন্যে বানিয়েছিল এই ছড়া, চূড়ামণি স্বয়ং যেদিন চললেন সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রায়।

দেখো মেরি জান, কোম্পানী নিশান
বিবি গিয়ে দমদমা উড়িছে নিশান।
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব বঙ্কা কাপ্তান
দেখো মেরি জান লিয়া হৈ নিশান॥

আয়া জোগাড় করে দিয়েছিলেন স্বয়ং মীরজাফর। হিন্দুস্থানী মুসলমানী । আহা! ক্লাইভের ছেলে। ক্লাইভ কীই না করেছেন আমার জন্যে। বাংলার নবাব বানিয়েছেন আমাকে। সিরাজের লুকনো কোষাগার থেকে লুটেপুটে এই যে এত টাকাকড়ি মণিমাণিক্য নিজের মুঠোয় ভরে নেওয়া, এ সবই তো তাঁর দৌলতে!

ক্লাইভ বিয়ে করেছিলেন মাদ্রাজে থাকতে। বন্ধুর বোনকে। পলাশী যুদ্ধের পর হলেন ছেলের বাবা। পলাশী যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর, দমদমে বানালেন বাগানবাড়ি। আগে ছিল ওলন্দাজদের কুঠি। পুরনো বাড়ি মেরামত করে সাজিয়ে গুছিয়ে ধবধবে নতুন। কলকাতাতেও বাড়ি ছিল একটা। রয়্যাল এক্সচেঞ্জে। কিন্তু কলকাতায় থাকতে মন নেই। মন তাদের কারুরই থাকতো না, যারাই কোম্পানীর উপরওয়ালা। আর সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতা তখন থাকার জায়গাই নয়। সিরাজের আক্রমণে ভেঙেচুরে তছনছ। তার উপর জল বাতাস ভাল নয়। একটু ছুটিছাটা পেলেই একটু-আধটু আমোদের লোভে ক্লাইভ তাই বিবিজানকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতেন দমদমে। আর তখন মীরজাফরের জোগাড় করে দেওয়া আয়ার কোলে ক্লাইভের ছেলে। বাড়ির ছাদে উড়ছে কোম্পানীর নিশান। আর আয়া গাইতো এই ছেলেভুলনো ছড়া।

তৃতীয়, অর্থাৎ শেষবার যখন কলকাতায় এলেন, সেই সময় থেকেই ক্লাইভের দমদমে পাকাপাকি বাস। সংস্কৃতের পন্ডিত, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একজন প্রধান অনুরাগী, সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারক স্যার উইলিয়াম জোন্স তখন থাকতেন গার্ডেনরীচে। ইলাইজা ইম্পে কাশীপুরে। হেস্টিংস আলিপুরে। বারওয়েল সাহেব সেন্ট স্টিফেন গির্জার কাছে।

১৭৬০। ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ। দ্বিতীয়বার নিজের দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ক্লাইভ। এর আগে গেছেন একবার। আর্কট জয়ের পর। তখন বয়স ছিল ২৮। প্রথমবার যখন গিয়েছিলেন তখন একজন

সাধারণ কর্মচারী। দ্বিতীয়বার যখন গেলেন তখন ক্লাইভ একজন অসাধারণ রাজপুরুষ। গোটা লন্ডন শহর তাঁকে সম্মান জানাতে উদ্‌গ্রীব। মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা। ঘরে ঘরে জয়গান। আর ক্লাইভের নিজের ঘরে মানপত্র রাখার আর জায়গা নেই।

ইংলন্ডের রাজা বললেন, নাও তোমার প্রাপ্য গৌরব। আজ থেকে তুমি লর্ড। মন্ত্রী পিট বললেন, তোমাকে কি বলে সম্মান জানাবো? তুমি তো স্বর্গ থেকে নেমে-আসা এক বীর যোদ্ধা।

কোম্পানীর লোকেরা ডাকলে, মহাসভা। সঙ্গে ভোজ। ভোজ-সভায় সকলের মুখেই ক্লাইভের স্তব গান।

ক্লাইভ যখন ইংলন্ডে, বাংলার গদীতে তখন তাঁরই আপনজন, মীরজাফর। ১৭৬৪। জুন মাসের ৪ তারিখ। তৃতীয়বার ফিরতে হলো কলকাতায়। অসীম ক্ষমতার অধিকার দিয়ে কোম্পানী আবার তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, অরাজক বাংলাকে দমন করতে। কিন্তু তখন আর মীরজাফর নেই। মারা গেছেন মাত্র ক'মাস আগে। মৃত্যু-শিয়রে আর একবার দুই বন্ধুর দেখা হবে, সাধ ছিল মীরজাফরের। মিটলো না। মরার আগে বন্ধুর নামে লিখে দিয়ে গেছেন পাঁচ লক্ষ টাকা।

পাদশা শাহ আলম
দিল্লীসে পালম।

পাদশা মানে বাদশা। দ্বিতীয় শাহ আলম তখন দিল্লীর বাদশা। নামেই সম্রাট। কাজেকর্মে কিছু নয়। লোকে মানে না, গনে না। তাঁর যা কিছু দাপট দিল্লী থেকে তিনচার মাইল দূরের পালম নামের গ্রাম পর্যন্ত। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতার এই দৌড় দেখেই তখন কেউ একজন বানিয়েছিল এই ছড়া।

শাহ আলম দেখলেন, ইংরেজরা যেখানে যার সঙ্গে যুদ্ধ করে, জিতে যায়। বকসার যুদ্ধে মোগলরা হেরে গেল গো-হারান। যুদ্ধে হেরে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পালিয়ে গেলেন। মীরকাশিম

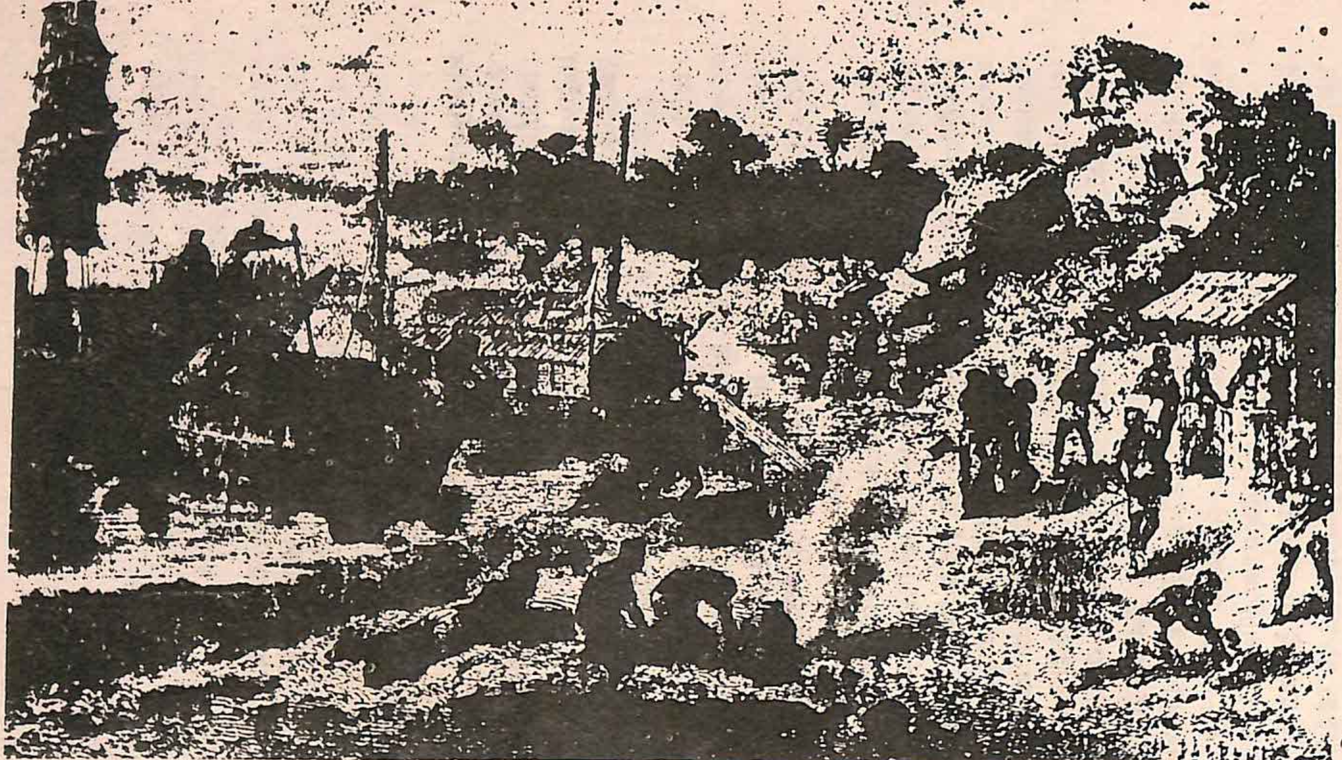
ফকির সেজে গা ঢাকা দিলেন বনেজঙ্গলে। শাহ আলম দেখলেন, মারলে ইংরেজরাই মারবে। তার চেয়ে আগেভাগে ইংরেজদের হাতেই ধনদৌলত, রাজ্যপাট, মানসম্মান সঁপে দেওয়া ভাল।

১৭৬৫। ১২ অগাস্ট। এলাহাবাদের তাঁবুতে বসে আছেন শাহ আলম। একে একে ইংরেজ সেনানায়করা নত মস্তকে সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে কুর্নিশ ঠুকে। অবশেষে ক্লাইভ। নতজানু হয়ে সম্রাটের পদপ্রান্তে বসলেন। সম্রাট তাঁর হাতে তুলে দিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি পাট্টা। এখন থেকে ইংরেজরাই পেল গোটা দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার। আদায় করা রাজস্ব থেকে বাৎসরিক বৃত্তি পাবেন দিল্লীর সম্রাট, বাংলার নবাব। বাকী সব ইংরেজদের এবং ইংরেজরা যেমন খুশী তা খরচ করতে পারবে। দিল্লীর সম্রাটের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল ২৯ লক্ষ টাকা। ক'বছর বাদেই সে-বৃত্তি বন্ধ। বাংলার নবাবের জন্যে ঠিক হয়েছিল ৫৩ লক্ষ টাকা। এক বছর পরে সেটা হয়ে গেল ৪১। তিন বছর পরে ৩২ ।

শাহ আলম দেওয়ানি পাট্টা তুলে দিলেন ক্লাইভের হাতে। চারপাশ থেকে বাদশার সৈন্যসামন্ত এবং প্রজারা আনন্দে আবেগে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো, জয় দিল্লীশ্বরের জয়। জয় শাহ আলমের জয়। ইংরেজ পক্ষও কম যায় না। বেজে উঠলো তাদের বাজনা-বাদ্যি! তাদের ইংরেজী ভাষার কলকোলাহল।

তোপধ্বনিতে কাঁপছে কলকাতা। ক্লাইভ কলকাতায় আসছেন সসৈন্যে দিল্লী জয় করে। তখনকার কালের কোম্পানীর সেপাইরা ছিল কালীভক্ত। কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিত। বাজী ফাটাতো। মানত করতো। সেদিনও কালীঘাটে প্রচন্ড ভীড়। কোম্পানীর সিপাইদের সেদিন মহোৎসব। মন্দিরে পুজো দিতে এসে কোম্পানীর হিন্দুস্থানী সিপাইরা সেদিন গান ধরলে—

কালি গৈয়ে কলকাত্তাকি,
যিনকে পূজা ফিরিঙ্গি কিন,
বাঙ্গালিকো মুলুক
ধনদৌলত দখল করলিন।



আদ্যিকালের কলকাতার গঙ্গাতীর

ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি॥
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
নকলে বাঙালী বাবু হল যে কাঙ্গাল॥
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং। ড্যাং ড্যাং ড্যাং। কলকাতা শহরের চারপাশ জুড়ে একদিন বেজে উঠলো ঢোল-সহরৎ। কী ব্যাপার? সবাই কান পেতে শুনতে পেল কোম্পানীর ঘোষণা। কলকাতার চারধারে নিজের খরচায় বনজঙ্গল কেটে যদি কেউ নিজের ঘরবাড়ি বানিয়ে নিতে পারে, তবে জমিজায়গা তাঁরই হয়ে যাবে। ঘোষণাটা কোম্পানীর। পরামর্শটা ক্লাইভের। পলাশী যুদ্ধের কিছু পরেই এই ঘটনা।

ক্লাইভ দেখলেন, প্রজা না থাকলে রাজা হয়ে লাভ কি? সিরাজকে সরিয়ে, মীরজাফরকে নকল নবাব সাজিয়ে আসল রাজ্যপাট তো তাদেরই হাতে। কিন্তু সিরাজের আক্রমণের সময় যারা শহর ছেড়ে পালিয়েছিল প্রাণের ভয়ে, তাদের যদি আবার ফিরিয়ে আনা না যায়, তাহলে সব মিথ্যে। মোট প্রায় ৫০ হাজারের মত লোক পালিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে সকলের আগে ফিরিয়ে আনা দরকার তাঁতীদের। বাংলা দেশের সবচেয়ে সেরা বাণিজ্যের জিনিস হলো, বস্ত্র। ইংরেজ-দের হাজার হাজার টাকা লাভ হয় ঐ বস্ত্র বেচে।

ঢোল-সহরতে কাজ হলো। পালিয়ে যাওয়া লোকজন একে একে ফিরে আসতে লাগলো শহরে। নতুন নতুন বাসিন্দেরও আনাগোনা শুরু হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

কলকাতা ধ্বংসস্তূপ হয়ে উঠেছিল পলাশী যুদ্ধের সময়ে। যেন একটা মরা শহর। এবার সেই মরা শহরের গায়ে রক্ত-মাংস, হাসি-খুশী, অর্থাৎ জীবনের চঞ্চলতা দেখা দিতে লাগলো একটু একটু করে। কালকেতুর মত, দিনে দিনে বাড়তে লাগলো কলকাতা।

পলাশী যুদ্ধের সময় শোভাবাজার, পাথুরেঘাটা এসব জায়গা ছিল জঙ্গলে ঠাসা। রাজা নবকৃষ্ণ, পাথুরেঘাটার ঠাকুররা নিজেদের উদ্যোগে ঐসব জায়গা গড়ে তুললেন বসবাসের যোগ্য করে। নবকৃষ্ণের নিজের নামে যে রাস্তা, সেটা তৈরী তাঁর নিজের খরচেই। এছাড়া

কলকাতা বাংলার রাজধানী। আর মুর্শিদাবাদ নয়।

আর সত্যি সত্যিই কলকাতা তখন যত কিছু নতুনের জন্মভূমি। নতুন রাস্তা, নতুন ঘাট, রাজপথে পালকীর বদলে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, টানা পাখার হাওয়া, গ্যাসের আলো, পাকা বাড়ি, কলের জল, সবই তো নতুন। এতসব নতুনের টানে স্বগ্রাম স্বদেশ ছেড়ে মানুষ তো কলকাতায় ছুটে আসবেই। আর কলকাতায় এলেই চাকরী, ব্যবসা কিংবা দালালী জুটে যাবেই। তারপর প্রচুর পয়সা। পয়সা হাতে এলেই বাঙালীর ঘরে ইংরেজীয়ানার আনাগোনা। আর বাবুগিরি দেখিয়ে ইংরেজদের মনযোগটাও কেড়ে নেওয়া যায় তাড়াতাড়ি। তার ফলেই ঘোড়-দৌড়, যাত্রা থিয়েটার, বাঈজী নাচ, ভোজসভা, দোল-দুর্গোৎসব, বাপের শ্রাদ্ধ, বেড়ালের বিয়ে এমনি আরও কত কি। সাহেবদের মন পেলে আরও বেশী ব্যবসায় সুযোগ। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আরও অনেক সুবিধে। অতএব চলো কলকাতা।

কলকাতায় তখন জমির দাম—জলের দাম। এখন সে-সব দাম শুনলে মনে হবে রূপকথা। এইসব হিসেব পলাশী যুদ্ধের পর। কুমোরটুলিতে ১ কাঠা জমির দাম ১১ টাকা। ১৭৮০তে সিমলে অঞ্চলে ১০ টাকায় ১ কাঠা জমি। বাগবাজারে ২৫। যত লোক বেড়েছে, দাম বেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। উনিশ শতকের গোড়ায় ধর্মতলা, বৌবাজার অঞ্চলে ঐ ১ কাঠা জমির দাম দাঁড়িয়েছিল দুশো থেকে আড়াইশো টাকা।

যত নতুন বাসিন্দে আসতে লাগলো, যত গড়ে উঠতে লাগলো কোঠা বাড়ি, পাকা দালান, বাড়তে লাগলো জমির দাম, ততই সাধারণ মানুষরা অর্থাৎ জেলে জোলা তাঁতী শাঁখারী এরা শহর থেকে উৎখাত হয়ে আবার ফিরে গেল গ্রাম দেশে, শহর থেকে দূরে। কলকাতা শহর হয়ে উঠলো ধনী ব্যবসায়ীদের শহর। শুধু তার গা থেকে মুছে ফেলা গেল না কতকগুলি অঞ্চলের নাম। সে-সব নামের মধ্যে গাঁথা রয়েছে কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দেদের বসবাসের ইতিহাস। যে শ্রেণীর লোকের যেখানে বাস, যেমন কাজ, তার থেকেই সে-সব অঞ্চলের নাম। যেমন, কলুটোলা, আহিরীটোলা, কুমোরটুলী, পটুয়াটোলা, দর্জিপাড়া, মুচিপাড়া, কাঁসারীপাড়া, কসাইটোলা, শাঁখারীটোলা। কলকাতা দিনে দিনে নতুন হয়েছে। শুধু পুরনো কালের স্বাদটুকু রয়ে গেছে এইসব নামের মধ্যে।

বেহালা থেকে কুল্‌পি পর্যন্ত ৩২ মাইল একটা রাস্তাও তিনি বানিয়ে দিয়েছিলেন গাঁটের পয়সায়।

ক্লাইভের আমল থেকেই কলকাতার আবার নতুন করে গড়ন শুরু। কলকাতা তখন থেকে দু'ভাগে ভাগ। একদিকে বাঙালীদের পাড়া। সেটা ইংরেজদের ভাষায় নেটিভ টাউন। আর একদিকে ইংরেজদের পাড়া। সেটা হোয়াইট টাউন।

নেটিভ টাউনে তখন কে কোথায় বাস করতেন, শোনো। সুতানুটিতে রায় রাঁয়া মহারাজা রাজবল্লভ। মহারাজা নন্দকুমারের ছেলে রাজা গুরুদাস চড়কডাঙগায়। এখন সেটা নতুন বাজার এলাকা। পাথুরেঘাটায় ঠাকুর পরিবার ছাড়া মল্লিকরা। আর আন্দুল রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান রামচরণ। পাইকপাড়ায় হেস্টিংসের দেওয়ান গঙগাগোবিন্দ সিং। কান্তবাবুও থাকতেন ঐখানে। বড়বাজারে ছিল বৈষ্ণবচরণ শেঠের বাড়ি। আর গৌরী সেনের। গৌরী সেনের ছিল অগাধ টাকা। দেনার দায়ে যার যখন হাতে হাত-কড়া, গৌরী সেনের টাকা তাকে বাঁচাতে তক্ষুনি মজুত। নামকরা দাতা ছিলেন তিনি। সেই থেকে প্রবাদবাক্যে তিনি আজও জীবিত। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' বড়বাজারে থাকতেন বিখ্যাত বসাকরাও। বাংলার দেওয়ান রেজা খাঁর একটা বাড়ি ছিল চিৎপুরে। সিমলা অঞ্চলে থাকতেন রামদুলাল দে। এক সময় কলকাতার ধনকুবের ছিলেন তিনি। কুমোরটুলিতে মিত্ররা। শ্যামবাজারে বিখ্যাত বংশ তখন বসুরা। দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কলুটোলায় বিখ্যাত শীলেরা। এই শীল বংশের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীল। বহুবাজারের বিখ্যাত পরিবার মতিলাল বংশ। এই বংশের আদি পুরুষ বিশ্বনাথ মতিলাল। একসময় বড়বাজারের কাঁসারীপট্টীর মালিক ছিলেন এ'রাই। ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত পরিবার ঘোষেরা। ইয়ং বেংগলের অন্যতম নেতা, বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এই বংশের ছেলে। তাঁর বাবা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কুচবিহারের মহারাজার কলকাতার এজেন্ট। তাছাড়া ছিল নিজের ব্যবসা বাণিজ্য। মিত্র ছাড়া কুমোরটুলির আরও বিখ্যাত পরিবার সরকারেরা। বনমালী সরকারের কথা তো আগেই শুনেছো।

ক্লাইভের আমলে শুরু। কিন্তু হেস্টিংসের আমল থেকেই আসল বাড়-বাড়ন্ত কলকাতার। তার বড় কারণ হেস্টিংসের আমল থেকেই

জাল, জুয়াচুরি, মিছে কথা
এই তিন নিয়ে কলিকাতা।

এ ছড়ার উৎপত্তির মূলে পঞ্চ পান্ডব। তবে এ পঞ্চ পান্ডব মহাভারতের নয়। কলকাতারই। এ'রা হলেন রাজা নবকৃষ্ণ, শোভাবাজারের। কৃষ্ণকান্তবাবু, শ্যামবাজারের। গঙ্গাগোবিন্দ সিং, পাইকপাড়ার। আর দেবী সিং, ক্লাইভ স্ট্রীটের। পলাশী যুদ্ধের পর এ'রা হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। এ'দের হঠাৎ-বড়মানুষিআনায় ফুলঝুরির আলোয় কলকাতা আলোয় আলোময়। লোকে এ'দের আরেকটা নাম দিয়েছিল আদরের। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পোষ্যপুত্র। এই পঞ্চ পান্ডবের সঙ্গে ছিলেন আরেকজন, তিনি কৃষ্ণ। অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। পলাশীর যুদ্ধের এবং সিরাজকে সিংহাসন থেকে সরানোর ষড়যন্ত্রের প্রথম নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। গোপন সভা বসেছিল মুর্শিদাবাদে, জগৎ শেঠের বাড়িতে। কৃষ্ণচন্দ্রই কলকাতায় এসে গভর্ণর ড্রেকের কাছে গোপন বার্তা পেঁছে দিলেন ষড়যন্ত্রের। পাছে কেউ সন্দেহ করে, রাজা রটিয়ে দিলেন যে, তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন কালীঘাটে, দেবী দর্শনে, চলেছেন মন্দিরে পুজো দিতে। সঙ্গে ছিল পাত্রমিত্র সভাসদ্। তাদের সামনে রেখে নিজে আড়াল দিয়ে চলে গেছলেন সাহেবদের কুঠিতে। গিয়ে ড্রেক সাহেবকে অনুরোধ, আপনারা নিজেরা রাজা হয়ে এই হতভাগ্য দেশে শান্তি স্থাপন করুন। সিরাজের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত।

পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি। ১১ লক্ষ টাকা রাজকর কমিয়ে দিলেন অর্ধেক। পলাশীর স্মৃতিমাখানো পাঁচ পাঁচটি কামান দিলেন উপহার। উপাধি এনে দিলেন দিল্লী থেকে—মহারাজেন্দ্র বাহাদুর। অবশ্য এই উপাধি পাওয়ার পিছনে অনেকটা হাত ছিল রাজা নবকৃষ্ণের।

কিন্তু এমন কথা মনে করলে ভুল হবে যে, এই ক'জনই কেবল কলকাতায় জাল, জুয়াচুরি এবং মিথ্যে কথার জনক। তা কিন্তু নয়।

জাল, জুয়াচুরি, মিছে কথায় শুধু বাঙালীদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। সাহেবরাও এই কাজে কম দক্ষতা দেখায়নি সেকালে। তখন কোম্পানীর কর্মচারীদের চাকরীর স্তর ছিল চারটে। রাইটার, ফ্যাক্টর, জুনিয়ার মার্চেন্ট, সিনিয়র মার্চেন্ট। রাইটার-রা প্রথমে

কাজ করতো কোম্পানীর দপ্তরে। তারপর অভিজ্ঞ হলে এদের প্রমোশন দিয়ে বাংলার বাইরে পাঠানো হতো বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে। পলাশীর যুদ্ধের সময় এক এক রাইটারের মাইনে ছিল বছরে ৫ পাউন্ড। সেটা দেওয়া হতো ৬ মাস অন্তর। কলকাতায় পা দিয়েই এ-সব রাইটারের মনে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠতো হঠাৎ-নবাব হওয়ার সাধ। অথচ মাইনে সামান্য। তাহলে উপায়? উপায় ছিল দুটো। এক কোম্পানীর নাম করে বাজারে এনতার ধার করা। আর একটা হলো গোপন ব্যবসা চালানো, কোম্পানীকে লুকিয়ে। যারা এই ধরনের গোপন ব্যবসা করে রাতারাতি নবাব হবার চেষ্টা করতো, কোম্পানীর ভাষায় তাদের নাম ছিল 'ইন্টারলোপার'। এই ইন্টার-লোপিং করে এক একজন সাধারণ ইংরেজ কোটিপতি হয়ে গেছে দু'চার বছরে।

১৭৬৭। তখন কলকাতার গভর্নর ভেরিলিস্ট। তাঁর আমলে রাইটারদের বাবুগিরি এমন ভয়াবহ হয়ে উঠলো যে, কোম্পানীকে জারী করতে হলো কতকগুলো আইন। যেমন—

১। অবিবাহিত রাইটাররা একজন রাঁধুনী আর একজন চাকরের বেশী ভৃত্য রাখতে পারবে না। ২। গভর্নরের অনুমতি না নিয়ে কেউ ঘোড়া রাখতে পারবে না। ৩। দুজনে বা তিনজনে মিলে বাগান বাড়ি তৈরী করাও বারণ। ৪। এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরা চলবে না যাতে বিলাসিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আইন হলো, ফাইন হলো, ইংরেজদের টাকা বাড়ানোর লোভ কিন্তু কমলো না। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশে কেবল বদল হয় নবাব। বদলায় ইংরেজরা। ইংরেজদের হাতে পুতুল নাচানোর সুতো। আজ সিরাজউদ্দৌলাকে মেরে মীরজাফর। কাল মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিম, পরশু মীরকাশিমকে তাড়িয়ে নিজামউদ্দৌলা। তারপর আবার মীরজাফর। নাটক চলেছে এইভাবে। আর এই সব নাটকের নেপথ্যে রয়েছে, উৎকোচ। সাদা কথায় যাকে বলে ঘুষ। ঘুষ দাও, তোমাকে রাজা বাদশা বানিয়ে দেবো।

সিরাজকে মেরে মীরজাফর যে বাংলার নবাব হয়ে সিংহাসনে বসলেন, তার জন্যে কত ধনরত্ন যে ঘুষের বাবদ ব্যয় করতে হয়েছে, তার হিসেব শুনলে অবাক হতে হবে।—

গভর্নর ড্রেক ৩১,৫০০ পাউন্ড। ক্লাইভ ২১১,৫০০। ওয়াটস্

১১৭,০০০। কিলপ্যাট্রিক ৬০,৭৫০। ম্যানিংহাম ২৭,০০০। এরকম আরও অনেকে। এরকম উৎকোচলাভ আরও অনেকবার।

পলাশী যুদ্ধের ১৫ বছর পরে পার্লামেন্টে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে ক্লাইভ বলেছিলেন, আমি নিজে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা না করে সারাজীবন যুদ্ধের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছি। দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমাকে উপহার দিতে চাইতেন। আমি যদি তার সব কিছু গ্রহণ করতাম, তাহলে কোটিপতি হতে বেশী সময় লাগতো না। মুর্শিদাবাদের কোষাগারে যে রাশি রাশি মনিমুক্তো ছিল, আমি যে তার সামান্য গ্রহণ করেছি, তা ভেবে আমি নিজেই আশ্চর্য।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ যখন দেশে ফিরেছিলেন, স্যার জন ম্যালকম নামে এক সাহেব হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন, ক্লাইভের বাৎসরিক আয় ৪ লক্ষ টাকা।

শুধু একা ক্লাইভ নন, এ রকম রাজকীয় ভাগ্য নিয়ে অনেক সাধারণ রাইটার একদিন কলকাতা ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে গেছেন। এক একজন এককেটি ক্ষুদে নবাব। এবং এই নবাব হওয়ার পিছনে মূলমন্ত্র তিনটে। জাল, জুয়াচুরি এবং মিথ্যে কথা।

এত টাকা নাহি দিবে সাহেব আমার।
নাহি লব মূল্য, আমি দিব উপহার॥
ভাবিলেন, ধন্য আমি এই ভূমন্ডলে,
কিবা শোভে মুক্তোহার শ্বেতাঙ্গীর গলে।

হেস্টিংস বাড়িতে নেই। তাঁর স্ত্রী মেরীর হাতে একটা মুক্তার মালা। আলো ঠিকরে পড়ছে তার প্রত্যেকটি দানা থেকে। মেরী একেবারে মুগ্ধ। যেন চোখ ডুবে আছে একটা স্বপ্নের মধ্যে। এক সময় চোখ তুলে মণিকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, কত দাম? মণিকার জানালে, দাম তো অনেক। তবে কমিয়ে-সমিয়ে কেবল আপনাকে দিতে পারি মাত্র ৪০ হাজার টাকায়। লাটগিন্নীর বুক

থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। এত দাম! মুক্তামালাটি মণিকারের হাতে ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন যেমনি, মণিকার সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে জানালে নিষেধ—না না, খুলবেন না।

খুলবো না? মেরীর চোখে বিস্ময়।

মণিকারের চোখেও জল।—ম্যাডাম, এ মুক্তামালা আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্যেই আনা।

সে কি? কেন?

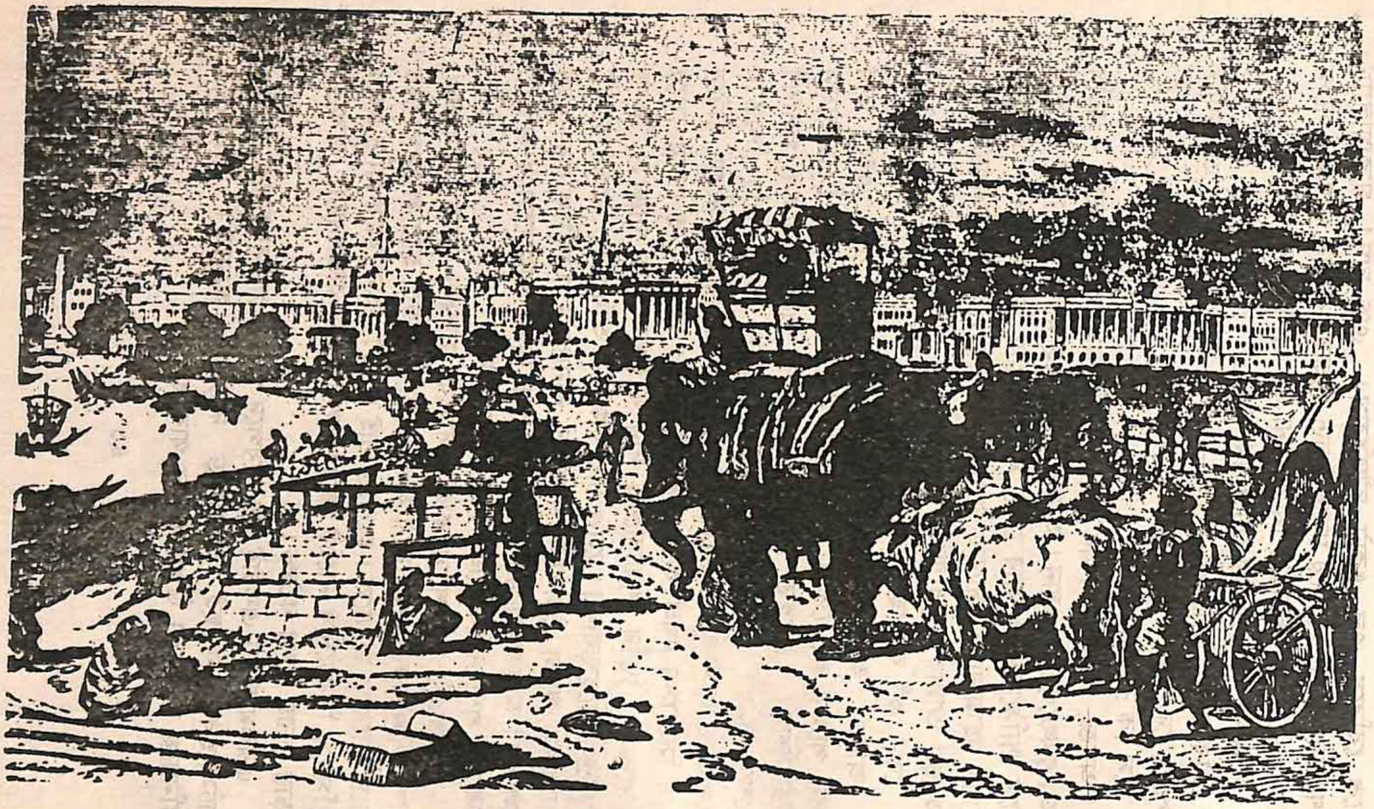
আজ্ঞে, আমি মণিকার নই। আমার নাম কালীপ্রসাদ। আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান। আমার প্রভুই এই মালা আপনাকে উপহার দিতে পাঠিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে একটি নিবেদনও। আপনার স্বামী মহামান্য লাটসাহেব গঙ্গাগোবিন্দের পরামর্শে অবিচার করে চলেছেন আমার প্রভুর উপর।

কেন, কী করেছেন তিনি?

আজ্ঞে, আপনি তো জানেন, আমার প্রভু এবং তাঁর প্রথম পক্ষের বড় ছেলে শিবচন্দ্রকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন মীরকাশিম। যেহেতু তিনি ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন পলাশী যুদ্ধের সময়। আমার প্রভু যখন হাজতে, তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে শম্ভুচন্দ্র নিজের পিতা এবং ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে বসেছেন। এখন রাজা মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি শিবচন্দ্রকেই দান করেছেন নিজ রাজ্য। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র নাছোড়বান্দা। সেও চায় রাজত্বের অধিকার। এখন গঙ্গা-গোবিন্দর সঙ্গে কৌশলে শম্ভুচন্দ্র নানারকম ফন্দীফিকির এঁটে চলেছেন। আর গঙ্গাগোবিন্দ আমাদের মহামান্য লাটসাহেবকে ভজিয়ে চলেছেন শম্ভুচন্দ্রকে রাজ সনদ পাইয়ে দিতে।

লাটগিন্নী সব শুনে কালীপ্রসাদকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যান। আমি রাজার হয়ে লাটসাহেবের কাছে আবেদন জানাবো। হলোও তাই। পত্নীর অনুরোধে পতি জল। হেস্টিংস শিবচন্দ্রের নামেই জারী করেছিলেন রাজসনদ। উপরের ছড়ায় তারই উপর কটাক্ষ।

এরকম ঘটনা একটাই নয়। বিপদে পড়লে লাটসাহেবকে এড়িয়ে লাটসাহেবার কাছেই করজোড়ে দাঁড়াতো অনেকে। উপকারের বিনিময়ে বহুমূল্য উপহার তো থাকবেই।



পুরনো কলকাতার চৌরঙ্গী রোড

হাতী পর হাওদা
ঘোড়া পর জিন্‌
জলদি আও জলদি আও
ওয়ারেন হেস্টিন।

টাকা চাই, টাকা চাই, গভর্ণর জেনারেল হওয়ার দিন থেকেই হেস্টিংসের এই চিন্তা। ২৬৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয়েছে মাদ্রাজে, মহীশূর যুদ্ধের খরচ জোগাতে। তাতেও চলছে না। প্রতিদিন তাগাদা আসছে আরো টাকা চাই।

আগে কোম্পানী বাংলার নবাবকে একটা ভাতা দিত। হেস্টিংস সে ভাতা কেটে অর্ধেক করে দিলেন। এতকাল ধরে দিল্লীর সম্রাটকে কোম্পানী নজরানা পাঠাতো মোটা টাকার, যেহেতু সম্রাটের অনুগ্রহেই তাঁরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান। সেটা অর্ধেক নয়, পুরো-পুরিই বরবাদ। এলাহাবাদ আর কোরা এই দুটো রাজ্যের আয় আগে ছিল দিল্লীর সম্রাটের পাওনা। ক্লাইভ সেই রকম চুক্তি করে গিয়ে-ছিলেন। হেস্টিংস সেটা দিয়ে দিলেন অযোধ্যার নবাব উজীরকে। শর্ত, ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হবে বছরে। আর যখনই দরকার, তখনই পাঠাতে হবে সৈন্যসামন্ত।

মাদ্রাজ থেকে ঘন ঘন টাকার তাগাদায় অস্থির হয়ে হেস্টিংস যখন দিশেহারা, সেই সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো বেনারসের চৈত সিং-এর কথা। লোকটাকে সেই ১৭৭৮ সাল থেকে টাকার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। দিচ্ছি দোব করে পাঠাচ্ছে না তো। এখনো পাওনা টাকা দেবার নাম নেই। কোম্পানীর অনুগ্রহেই লোকটা বেনারসের রাজা। বছরে ২২॥ লক্ষ টাকা খাজনা দেবার শর্তেই তো রাজত্ব দেওয়া। ১৭৮১। চৈত সিং-এর কাছে হুকুমনামা গিয়ে পৌঁছলো, বকেয়া টাকা মেটাও। আর সৈন্য পাঠাও হাজার খানেক। খবর পেয়েও ওদিকে চৈত সিং কিন্তু বেমালুম চুপচাপ। সাড়াশব্দ নেই মুখে। শোরগোল নেই দরবারে। আসলে চুপচাপ কেবল চৈত সিং-এর বাইরেটা। ভিতরে একটা ঝড় আছে। সেটা রাগের। আর সেটা একেবারেই বিনা কারণের রাগ নয়। বছরে ২২॥ লক্ষ টাকা খাজনা দিতে হবে, রাজত্ব করার বিনিময়ে, কোম্পানীর সঙ্গে এই তো চুক্তি চৈত সিং-এর। কিন্তু হেস্টিংস সাহেব কি কোনোদিন হিসেব কষে দেখেছেন

দফায় দফায়, যখন যেমন দরকার, এবং যখুনি দরকার, মোট কত টাকা আসলের চেয়ে সুদ হিসেবে গাঁটগচ্চা দিতে হয়েছে তাঁকে! হেস্টিংস যত পায়, তত লালায়।

কলকাতায় হেস্টিংস ঘন ঘন খবর নেন, বেনারস থেকে টাকা এল কি? আজ্ঞে না। সৈন্যসামন্ত? আজ্ঞে না। তেলেবেগুনে জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ একদিন হেস্টিংস সাহেব জানালেন, ঠিক আছে। জরিমানা জারী করে দাও চৈত সিং-এর নামে। ৫০ লক্ষ টাকা। আর শোনো, ঐ জরিমানার টাকাটা আমি নিজেই যাব আনতে।

গভর্ণর-জেনারেল স্বয়ং এসেছেন তাঁর রাজত্বে। কী সৌভাগ্য! চৈত সিং হাত বাড়িয়ে ছুটে এলেন অভ্যর্থনা জানাতে। সঙ্গে সঙ্গে, চৈত সিং-এর হাতে হাতকড়ি। চৈত সিং ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, তাঁর দেরী হওয়ার কৈফিয়ত জানাতে। সেসব কানে তোলার এক বিন্দু ইচ্ছে নেই হেস্টিংসের। চৈত সিং কিছু বলার আগেই তিনি হুকুম দিলেন, আসামীকে হাজতে পোরো।

আসল ঘটনাটা ঘটলো এর পরেই। রাজা বন্দী হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়লো রাজ্যে। খবর পেয়ে সৈন্যসামন্তরা গেল ক্ষেপে। এক মুহূর্ত দেরী না করে হেস্টিংসের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করলো তারা চারপাশ থেকে। একটা পুঁচকে রাজ্যের সৈন্যসামন্ত তাঁর মত প্রতাপশালী একজন শাসকের বিরুদ্ধে এভাবে লড়ায়ে নামবে, এমন অংক হেস্টিংস সাহেবের কষা ছিল না। এখন উপায় মাত্র একটি। যে পালায়, সে বাঁচে। হেস্টিংস পালাতে লাগলেন বেনারস ছেড়ে চুনারের দিকে। যাকে বলে চোঁচা দৌড়। পরে অবশ্য এদিক ওদিক থেকে আরো সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে তিনি দমন করেছিলেন বিদ্রোহ।

গভর্ণর জেনারেলের এই পলায়ন-পর্বের খবরটা ছড়িয়ে পড়লো মুখে মুখে। আর তখুনিই মুখে মুখে জন্ম নিল এই ছড়া, বেচারা হেস্টিংসের এই ঐতিহাসিক পলায়নকে অমর করে রাখতে।

মহারাজা চেৎ সিং কাশীধামে ছিল,
হেস্টিংসের সনে তার বিবাদ ঘটিল।
মাঝ থেকে কান্তবাবু লুটে মজা নিল,
মহামূল্য ধনরত্ন ঘরে নিয়ে এল।
রাজার ঠাকুর আর সুন্দর দালান,
নিয়ে এসে বসায়েছে করিয়া আপন।
পুকুর চুরির কথা জমিদারে জানে,
দালান চুরির কথা হেস্টিংস যে জানে।

চৈত সিং-কে আক্রমণ করতে গিয়ে হেস্টিংস-এর পালিয়ে যাওয়ার কথা আগেই শুনলে। হেস্টিংস যখন বেনারসে যান, সঙ্গে ছিলেন কান্তবাবু। কান্তবাবুর ভাল নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। এঁর সময় থেকেই কাশিমবাজার রাজবংশের শুরু। বাবা রাধাকৃষ্ণ নন্দী। আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের সিজনা গ্রামে। সেখান থেকে চলে এলেন কাশিমবাজারে। কেননা, কাশিমবাজারের তখন দারুণ নামডাক গোটা দেশ জুড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার হিসেবে। কাশিমবাজারে এঁদের ব্যবসা ছিল সুপুরি আর রেশমের। দোকানটা আবার ইংরেজদের কুঠি আর রেসিডেন্টের গায়ে। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে বেশ একটা মাখামাখি ভাব। ইংরেজদের সঙ্গে হরবখত মেলামেশা থেকে কান্তবাবু নাকি প্রায় দু' হাজারের মত ইংরেজী শব্দ রপ্ত করে ফেলেছিলেন, শুধু শুনে শুনে। বাংলায় ব্যবসাপত্রের হিসেব-নিকেশে হাত ছিল পাকা। তাই একদিন চাকরীও পেয়ে গেলেন ইংরেজ কুঠিতে। মুহুরীর চাকরী। ১৭৫৩। কলকাতা থেকে হেস্টিংস কাশিমবাজারে হাজির। চাকরীটা সামান্য। সেই থেকে কান্তবাবুর সঙ্গে চেনাজানা।

সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণের আগে, কাশিমবাজার দখল করেছিলেন মাঝপথে। সাহেবরা ভয় পেয়ে নবাবের কাছে এসে ধরা দিলে। বন্দী সাহেবদের হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মুর্শিদাবাদের জেলখানায়। সেই সাহেবদের মধ্যে হেস্টিংসও একজন। কাশিমবাজারে ওলন্দাজ কুঠির যিনি সর্বেসর্বা, নাম ভিনেট। তিনি গিয়ে নবাবকে ধরাধরি করলেন, হুজুর, হেস্টিংসকে ছেড়ে দিন। কোম্পানীর সামান্য একজন কর্মচারী। বিষও নেই, ছোবলও নেই।

নবাব ছেড়ে দিলেন হেস্টিংসকে। হেস্টিংস চলে এলেন কাশিমবাজারে।

ওদিকে সিরাজের আক্রমণের ভয়ে কলকাতা কুঠির সাহেবসুবোরা সবাই গা ঢাকা দিয়েছেন ফলতায়। এই সময় নবাবী শাসনের যা কিছু গোপন খবর জোগাড় করে, ফলতায় পাঠানোটাই ছিল হেস্টিংসের কাজ। কিন্তু বেশীদিন গোপন রাখা গেল না, এই গোপন খবর পাঠানোর ব্যাপারটা। নবাবের কানে পৌঁছতে যখন আর বাকি নেই, হেস্টিংস কাশিমবাজার ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলেন। এখুনি কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার। কোথায় যাই, কার কাছে যাই, ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল কান্তবাবুর নাম। অন্ধকারে চুপি চুপি হেস্টিংস হাজির হলেন কান্তবাবুর দোকানে। সেখান থেকে কান্তবাবুর বাড়িতে।

হেস্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত।
কোন স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়
হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।
কান্তমুদী ছিল তাঁর পূর্ব পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়
হেস্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ।
সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে
হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।

সেই পান্তাভাত আর চিংড়িমাছ খাবার পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। হেস্টিংস সেদিন গভর্নর জেনারেল, সামান্য কর্মচারী থেকে। এত বড় হয়েও তিনি কিন্তু দুঃখের দিনের উপকারী বন্ধু

কান্তবাবুকে ভোলেননি। তাঁকে করে নিলেন নিজের প্রিয়তম সাকরেদ। কান্তবাবু যেন হেস্টিংসের ছায়া।

হেস্টিংস যখন বেনারসে, কান্তবাবুও সঙ্গে। চৈত সিং-এর সৈন্যদের তাড়া খেয়ে হেস্টিংস পালালেন চুনারে। সেখান থেকে নতুন করে সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে আবার ফিরে এলেন বেনারসে। আবার নতুন করে আক্রমণ। সেনাপতি পপহামের আপত্তি ছিল রাজবাড়ির মেয়েদের বা দাসদাসী লোকজনের উপর অত্যাচার করায়। সৈন্যরা সে আপত্তি কানে তুললো না। রাজমাতা করজোড়ে অনুনয় করলে, আমাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করলে বিষয়সম্পত্তি, সোনা-দানা, ধনরত্ন সব ছেড়ে দেবো। কান্তবাবু রাজমাতার হয়ে হেস্টিংসের কাছে বয়ে নিয়ে গিছলেন সেই অনুরোধ। হেস্টিংস বললেন, রাজী। তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজমাতাকে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজমাতা সেটা পারলেন না। ফলে হেস্টিংসের সেনাবাহিনী তাঁদের নির্যাতন করার এতটুকু ত্রুটি রাখলে না। চোখের জলে ভিজে গেল রাজপ্রাসাদের ঘরবাড়ি, উঠোন ও দালান।

সামান্য একটু সমবেদনার বিনিময়ে কান্তবাবু রাজমাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন প্রচুর অলঙ্কার। সেটা আসল নয়। আসল হলো লুটের মাল। সৈন্যসামন্তরা যে যা পারলে নিলে। কান্তবাবুও বাদ গেলেন না। নিলেন রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, নিলেন রামচন্দ্রী মোহর, একমুখ রুদ্রাক্ষ, আর দক্ষিণাবর্তের শাঁখ। এও তেমন কিছু নয়। আসল যেটি নিলেন, সেটা হলো পাথরের তৈরি একটা গোটা দালান। রাজবাড়ি থেকে উপড়িয়ে এনে সেটাকে তিনি বসালেন কাশীমবাজারে, নিজের বাড়িতে।

কান্তবাবুকে দু'হাতে উজাড় করে উপহার দিয়ে গেছেন হেস্টিংস। টাকাপয়সা, মানসম্মান, জমিদারি, যখন যা পেরেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার রে!
তোর রাজ্যপাট জমিদারী কারে দিলি রে?
নন্দকুমার রায় ছিল বাংলার অধিকারী
হেস্টিংস সাহেব এল জান করিবার বারি।
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙি বেয়ে।
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোঁহারাতে হাঁস
জোড় বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুল্‌তি বাঁশ।
ছোটরাণী উঠে বলে বড়রাণী গো দিদি
সিঁতেয় ছিল কড়া সিন্দূর বঞ্চিৎ করলেন বিধি।

নন্দকুমারকে ফাঁসি কাঠে না চড়িয়ে হেস্টিংসের তখন উপায় ছিল না। নন্দকুমারের মত ধনী মানী আরও অনেকেই তো ছিল শহরে। তারা সবাই গাড়ি-বাড়ি, আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান এই নিয়ে কেমন মেতে আছে। রাজত্বে কোথায় কি হচ্ছে, রাজস্বের কোথায় কি হচ্ছে, কে টাকা ওড়াচ্ছে কোম্পানীর, কে শোষণ করছে সাধারণ মানুষকে, এসব দিকে তাদের মনও নেই, কানও নেই। কেবল যত গরজ ঐ নন্দকুমারের। লোকটার যেন একমাত্র কাজ হেস্টিংসকে কোম্পানীর কাছে হেয় করা। তাঁর ক'টা বাগানবাড়ি, কতটা বিলাসিতায় দিন কাটে তাঁর, তাঁর রাজত্বে ইংরেজ কর্মচারীরা কতখানি উচ্ছৃঙ্খল, নন্দকুমার নামের ব্রাহ্মণটার যেন এছাড়া আর জপতপ নেই। লোকটাকে শায়েস্তা করা দরকার। ছুতোনাতা পেলে হয় একটা। তারপর তিলকে তাল করতে কতক্ষণ! ছুতোনাতা জুটে গেল একদিন। সেটা জুগিয়ে দিলে বুলাকি দাস। মুর্শিদাবাদের একজন ধনী লোক। একবার অনেকগুলো টাকা ধার নিয়েছিলেন নন্দকুমারের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত সুদে আসলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ টাকা। বুলাকি দাসের ব্যবসা ছিল কোম্পানীর সঙ্গেও। বুলাকি দাস কোম্পানীকে বরাত দিয়ে দেন, কোম্পানীর কাছে তাঁর পাওনা টাকা থেকে নন্দকুমারের টাকাটা মিটিয়ে দেবার জন্যে। নন্দকুমার কোম্পানীর কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেলেন। হঠাৎ একদিন নন্দকুমারের নামে পরোয়ানা এসে হাজির। কী অভিযোগ? না, ছ-বছর আগে তুমি একটা দলিল জাল করেছ। এবং ঐ জাল দলিল

দেখিয়ে দু' লক্ষ টাকা আদায় করেছ কোম্পানীর কাছ থেকে। বিচার হবে। ১৭৭৫ সাল। মে মাসের ৬ তারিখ। ঘড়িতে রাত দশটা। নন্দকুমারকে নিয়ে যাওয়া হলো হাজতে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে চললো বিচার। সাজানো সাক্ষী। সাজানো বিচারক। বিচারের রায়, সেও আগে থেকে সাজানো। অতএব—

বাঙলা এগারো শত বিরাশির সালে—
একুশে শ্রাবণ শনিবার সকালে
ব্রহ্মনাশ হয়ে গেল আলিপুরের মাঠে,
হেস্টিংসের হৃৎকম্প হত যার দাপটে।
লোকারণ্য মাঠ ঘাট লাগিল কাঁদিতে,
ফাঁসী হল শুনে লোক লাগিল ছুটিতে।
লঘুপাপে গুরুদন্ড হইল ইহার;
হেস্টিংস ইম্পের কেমন বিচার।

ইম্পের পুরো নাম স্যার এলাইজা ইম্পে। ইনি ছিলেন এই মামলার প্রধান বিচারপতি। এঁর নির্দেশেই নন্দকুমারকে আটকে রাখা হয়েছিল জেলখানার আলোবাতাসহীন একটা সাধারণ কুঠরীতে। আবেদন জানানো হয়েছিল। নন্দকুমার একজন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তাঁর থাকার জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক। ইম্পের রায়ে, নাকচ।

ইম্পে একে হেস্টিংসের বন্ধু, তার উপরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর নাকটা চিরকালই উঁচু। লন্ডন থেকে সবেমাত্র চাঁদপাল ঘাটে এসে থেমেছে জাহাজ। ইম্পে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন নগরবাসীরা। তার মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। যাদের খালি গা, খালি পা। ইম্পে তাদের দিকে তাকিয়ে তখুনি মন্তব্য করলেন—"দেখ ভাই, আমরা ঠিক সময়েই এদেশে এসেছি। এদেশের লোকের পায়ে জুতো নেই, গা খালি। কী অত্যাচার! এখন দেখছি, ঠিক সময়েই এদেশে আদালত তৈরি করা হয়েছে। আমি এখানে ছ'টা মাস কাটাই, তারপর দেখবে এইসব লোককে কেমন করে পায়ে জুতো আর মোজা পরাতে শেখাই।"

ঘুড়ী তুড়ি যশ দান
আখড়া বুলবুল মনিয়া গান।
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥

পুরনো কলকাতার ডাকসাইটে বাবুদের নিয়ে এই ছড়া। বাবুরা কি নিয়ে দিন কাটাতেন, কি কি ছিল বাবুদের নেশা, তারই একটা ফর্দ দাখিল হয়েছে এর মধ্যে। মাথায় বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরনে ফিনফিনে কালোপাড় ধুতি, গায়ে মসলিন কিংবা দামী কেমব্রিকের বেনিয়ান, গলায় চুনোট করা উড়ুনী, পায়ে পুরু বগ্‌লস দেওয়া চীনে বাড়ির জুতো। এই হলো বাবুদের চেহারা। দিনে ঘুম, দুপুর পেরোলে ঘুড়ি উড়োনো, তুড়ি দেওয়া, বুলবুলির লড়াই বাধানো, সন্ধেয় সেতার এসরাজ বা বীণ বাজিয়ে কবিগান বা হাফ-আখড়াই শোনা, আরো বেশী রাতে বাগানবাড়িতে বাঈজী নাচের আসর, এই হলো বাবুদের চরিত্র।

বাবুরা কখনও গড়ের মাঠে গিয়েও ঘুড়ি ওড়াতেন। সেসব ঘুড়ির আবার অনেক নাম। ঢাউস ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি, এমন কত। বুলবুলির লড়াই শুরু হলো বেলা এগারোটা থেকে। শেষ হতো বিকেল চারটেয়। খেলা হতো মাঠের মধ্যে। সময়টা হতো শীতকাল। দু'দিকে দুই বাবুর দল। তাঁবু পড়ে যেতো মাঠে। মাঠ ভরে যেতো মানুষে মানুষে। তারপর লড়াই। লড়ায়ে নামতো প্রায় তিনশোর মত বুলবুলি, দুই বাবুর আলাদা আলাদা বুলবুলি মিলিয়ে। খেলার শুরুতে তাদের মাঝখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো কিছু খাবারদাবার। সেই খাবার নিয়েই দু-দল বুলবুলির কাড়াকাড়ি, মারামারি। যারা হারে, তারা উড়ে যায় আকাশে। লড়াই-এর ফলাফল বিচারের জন্যে একজন করে সালিসীও থাকতো মাঠে। সেকালে বুলবুলির লড়াই-এর জন্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে নামডাকওয়ালা, তাঁর নাম ছাতুবাবু। ভাল নাম আশুতোষ দেব। বাবা রামদুলাল হাটখোলার দত্তবাড়ির সরকার। মাস মাইনে পাঁচ টাকা। পরে ভাগ্যের জোরে হঠাৎ হয়ে যান বড়লোক। যখন মারা গেলেন, ছেলেরা বাবার শ্রাদ্ধ করলো পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে। ১৮৩৪-এ একবার মল্লিকবাড়ির ছেলে হরনাথের সঙ্গে ছাতুবাবু নেমেছিলেন বুলবুলির লড়ায়ে। সালিসী ছিলেন রাজা সুখময়

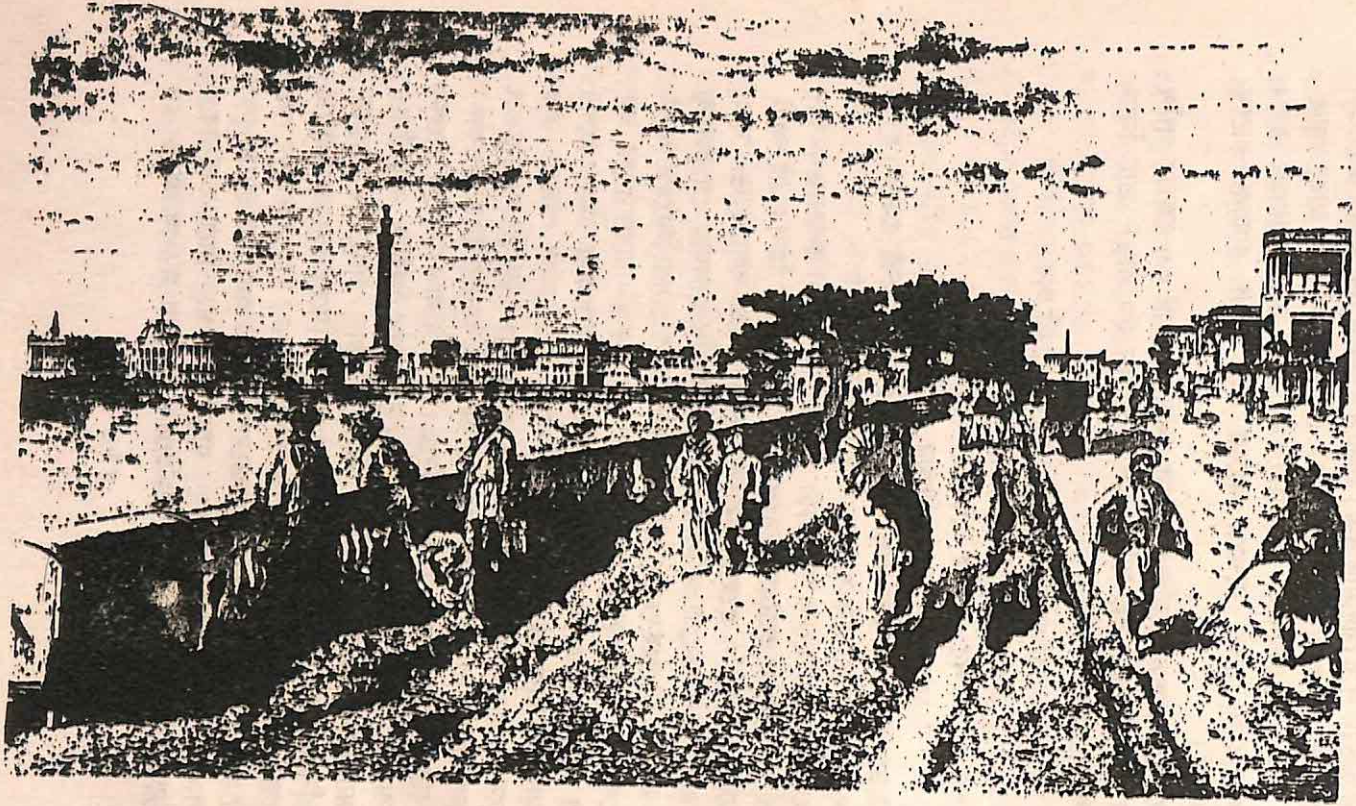
রায়ের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ রায়। লড়ায়ে ছাতুবাবুরই জিত। আরেকটা জোরদার লড়াই হয়েছিল ১৮৫৩-য়। একদিকে সিমলের বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র। আরেকদিকে জোড়াসাঁকোর রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রাজা সুখময় রায়ের বড় ছেলে রামচন্দ্র রায়ের দত্তকপুত্র।

খেলা আরম্ভ হয়েছিল সকাল দশটায়। মোট ৩৭ জোড়া পাখি নিয়ে খেলা। তাতে দয়ালচাঁদই জিতে গেলেন ২৭ বার। তাই নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা—

একে একে রাজাজীর ভালো পাখী সব
বাবুর পক্ষীর কাছে হলো পরাভব।
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর
সমর করিল যেন অমর কুমার।

ছড়ার মধ্যে 'আখড়া' কথাটা এসেছে 'হাফ-আখড়াই' থেকে। হাফ-আখড়াই তখনকার এক ধরনের আধুনিক কবিগান।

সেকালের বাবুদের আরেকটা আমোদ ছিল, দান করা। তখনকার কালে 'কলকাতার আটবাবু' বলে একটা কথার চল ছিল। এই আট-বাবুদের শিরোমণি হলেন রামতনু দত্ত। তাঁকে বলা হতো 'বাবু তো বাবু তনু বাবু।' তারপর হলেন নীলমণি হালদার, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা নবকৃষ্ণের ছেলে রাজা রাজকৃষ্ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব-পুরুষ ছাতু সিংহ, ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নকু ধরের দৌহিত্র রাজা সুখময় রায় আর চোরবাগানের মিত্র বংশের একজন। এবার তনুবাবুর দান নিয়ে একটা গল্প বলি। এক বামুনের কানে পুঁজ। ডাক্তার বলেছে কানে আতর দিতে। বামুন এল গোকুল মিত্রের বাড়িতে। গোকুল মিত্র বললেন, আমার বাড়িতে কেন? তনুবাবুর বাড়ি মোছা হয় আতর দিয়ে। সেখানে যাও। বামুন গেলেন তনুবাবুর বাড়ি। তনুবাবুর বাড়িতে দানের জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাত্র দেওয়াটা ছিল নিষেধ। তনুবাবু বামুনকে বললেন, পাত্র নিয়ে এস। বামুন ফিরে চলেছে। গোকুল মিত্রের লোকজন তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, কি হলো, আতর পেলে না? বামুন বললে, পাত্র কই? পাত্র? গোকুল মিত্রের লোকজনেরা তখুনি বামুনের হাতে তুলে দিলে একটা ইয়া প্রকান্ড ঘড়া। বামুন সেই ঘড়া নিয়ে তনুবাবুর বাড়িতে হাজির। তনুবাবু বুঝেছিলেন, কা'দের মতলব আছে এর



পুরনো কালের এস্‌প্লানেড

পিছনে। চোখে হয়তো ছিল রাগ। কিন্তু মুখে ছিল আদেশ, সরকারকে। ঘড়াটা ভরে দাও আতরে।

ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত।
কলকাতাতে ফিটন রথ।

গোড়ায় ছিল, যানবাহন বলতে, শুধু পালকি। আপিস-আদালত, শখের বেড়ানো, সুখের বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, সব কিছুতেই পালকি। চারদিক খোলা, ছাদের মাঝখানটায় উঁচু, কাঠের গায়ে নানান রকম নক্‌শা কাটা কারুকাজ, এই ছিল পালকির চেহারা, প্রথম দিকে। তারপর এল ঢাকা পালকি, চেয়ার পালকি। চেয়ার পালকিরই আরেক নাম তাঞ্জাম। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত অনেক সময় আসা-যাওয়া করতেন এই তাঞ্জামে চড়ে।

হেস্টিংসের আমল থেকে পালকির সঙ্গে পাল্লা দিতে এল গাড়ি। চেরেট, বগি, ল্যান্ডোলেট, পালকি গাড়ি, ব্রাউনবেরী, দশফুকুরে, ক্যরাস, ব্রুহাম, এমনি আরো কতরকমের গাড়ি, ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগল কলকাতায়। বনজঙ্গল সাফ হয়ে যত বাড়ে পথঘাট, তত বাড়ে গাড়ি-ঘোড়া। গাড়ি তো অনেক। কিন্তু গাড়ির রাজা কে? গাড়ির রাজা ফিটন। ফিটন চাপে তারাই বেশী, যাদের বেশ দু-পয়সা রোজগার, ডাইনে আনতে বাঁয়ে ফুরোয় না যাদের, তেমনি সব সচ্ছল সাহেব। আর চেপে বেড়াতো তরুণ সাহেব-মেমরা। যাদের বিয়ে হবে ক'দিন পরে, যারা বিয়ে করেছে ক'দিন আগে, অথবা যারা এখনো কে কাকে বিয়ে করবে তার ঠিক হয়নি। কার গাড়ির কেমন ঘোড়া, তাই দেখে মেমসাহেবরা ঠিক করবেন, মালা পরাবেন কার গলায়। ঘোড়ার মধ্যে রাজা তখন ওয়েলার।

ফিটন শুধু সাহেবরাই চড়তো না। বাঙালীবাবুরাও ফিটন হাঁকাতেন খুবই। গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে তো যাওয়া চাই রোজ। ফেরার পথে ইডেন গার্ডেনে গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসে বিলেতী ব্যান্ড বাদ্য শোনা।

হেস্টিংসের আমলে ছিল স্টুয়ার্ট কোম্পানী কোচমেকার। স্টুয়ার্টের কারখানায় অনেক সময় নামকরা শিল্পীরাও কাজ করেছে। পাল্কির গায়ে নক্শা, বগির চারপাশে নানান রকম ডিজাইন। ব্রুশেলস্ থেকে একবার একজন শিল্পী এসেছিলেন কলকাতায়। নাম সলভিন্স। অজস্র ছবি এঁকে গেছেন কলকাতার। পথঘাটের ছবি। মানুষজনের ছবি। আমোদ-উৎসবের ছবি। তাঁর ছবিতে সেই যুগটাকে যেন চোখের সামনে দেখা যায়। সেই সলভিন্স, কলকাতায় পা দিয়ে যখন দেখলে খাবার পয়সা নেই, ঐ স্টুয়ার্ট কোম্পানীতেই চাকরী করতেন নক্শা আঁকার।

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি।
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।

বেলগাছিয়া ভিলা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ি। ঐ রকম বাগান এবং বাড়ি, ঠিক ছবির মত, সেকালের অত বাবুয়ানির যুগেও আর কারো ছিল না। বিরাট বাগান। তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বইতো মতিঝিল। ঝিলের ঝিলমিল জলে নীলপদ্ম। শীতের সময় সে বাগান হেসে উঠতো গোলাপে গোলাপে। তার সঙ্গে বিদেশী সব মরশুমি ফুল। পিঙ্ক, পিটুনিয়া, ফ্লক্স, সার্ক্সপার্স, জিনিয়া এমনি কত। বাগান পেরোলে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার দেয়ালে দেয়ালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের আঁকা ছবি। দেয়ালের গায়ে বিরাট বিরাট ভাস্কর্য। বৈঠকখানার পিছনে মার্বেল বাঁধানো ফোয়ারা। উপরে কিউপিডের মূর্তি। মতিঝিলের মাঝখানে একটা দ্বীপ। তার উপরে একটা বাড়ি। সেটা শুধু গ্রীষ্মকালটা কাটানোর জন্যে। বাগান থেকে ঐ বাড়িতে যাবার জন্যে ঝিলের উপর দিয়ে দুটো সেতু। একটা ঝোলানো লোহার। আরেকটা হালকা কাঠের। আমোদ-প্রমোদের যত কিছু আসর সেটা বসতো এইখানেই। শহরের পুবদিকে বেলগাছিয়া। তখনকার কালে এর তাই নাম ছিল আরেকটা—কলকাতার ওয়েস্ট এন্ড অথবা কেনসিংটন।

বেলগাছিয়া ভিলার খ্যাতি, তার নামডাক শুধু রূপের জন্যে নয়। তার জমকালো নৈশ ভোজের আসরের জন্যেও। উপরের ছড়াতে ঐ তো শুনতে পাচ্ছো ছুরি-কাঁটার ঝন্ ঝন্ শব্দ। এখানকার নৈশভোজের আসরে প্রায়ই যাঁরা হাজির হতেন, তাঁরা শহরের বাছাই করা সেরা সেরা লোক। কি সাহেব, কি বাঙলীবাবু, অতিথিরা সকলেই এক ডাকে চিনবার মত। আসতেন কাউন্সিলের সদস্যরা। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা। বিভিন্ন পরগণার যাঁরা জমিদার, যাঁরা জেনারেল। আসতেন বুড়ো হয়ে যাওয়া সিভিলিয়ান আর সামরিক কর্মচারীরা। আসতেন তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদেরই পাশে পাশে ইয়ং বেঙ্গলের তরুণ বাবুরা। কোট-প্যান্টের পাশে ধুতি-চাদর। সাহেবের পাশে বাঙালী। সাহসী ক্যাপটেন টেলর সাহেব, তাঁর পাশে খোশগল্পের রাজা প্যাট্রিক। আবেগপ্রবণ রাজা দক্ষিণারঞ্জনের পাশে আইনজ্ঞ প্রসন্নকুমার ঠাকুর। সব মিলিয়ে মেলামেশা, মনের আদান-প্রদানের এক অপূর্ব প্রীতি-সম্মেলন।

বেলগাছিয়ায় যখন এইসব আমোদ-উৎসবের আসর বসতো, দ্বারকানাথের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ তখন যুবক। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি এই সময়কার একদিনের কাহিনী লিখে গেছেন। সেটা শোনাচ্ছি—

"যখন এখানে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গভর্ণর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবিও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল। এই ইংরাজদের মহাভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙালীরা বলিয়াছিলেন যে, 'ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙালীদের ডাকেন না।' এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি একদিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙালীদের লইয়া বাঈনাচ ও গানবাজনা দিয়ে এক জমকালো মজলিস করিলেন।"

১৮৪১-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী ছিল সেদিনের তারিখ। বেলগাছিয়া ভিলায় মিস্ ইডেনের সম্মানে ভোজসভা। ঘরে ঘরে আলো। আলো ঠিকরে পড়ছে দেওয়ালের আরশি থেকে। মেঝেয় মির্জাপুরের কার্পেট। তার উপরে লাল জাজিম।

তিনি বাতিল করেন এই প্রথা, সরকার পক্ষকে দিয়ে আইন তৈরী করিয়ে।

রামমোহনের আরেক অপরাধ তিনি ইংরেজী শিক্ষা, আর মেয়েদের লেখাপড়া শেখার পক্ষে। ১৮৩০। পাদরী ডাফ কলকাতায় এসেছেন। তখন গোটা কলকাতায় ৫ হাজারের মতো ছেলে স্কুলে পড়াশুনা করে। তার মধ্যে মাত্র ৫০০ শোর মতো ছেলে ইংরেজী শেখে। ডাফ কলকাতায় আসতেই জেনারেল বীটসন তাঁকে জানালেন, এক্ষুনি রাজা রামমোহনের সঙ্গে দেখা করো। তিনি আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী। প্রথম আলাপেই রামমোহন জানালেন যে, বিদ্যালয়ে পাঠ শুরু হওয়ার আগে বাইবেল থেকে 'লর্ডস প্রেয়ার' থেকে কিছু অংশ আবৃত্তি করাতে তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর মতে শিক্ষার মধ্যে থাকবে ধর্মবোধ। আর ধর্মবোধ হবে উদার। রামমোহন ডাফকে আরও জানালেন, তিনি যদি নতুন করে বিদ্যালয় গড়তে চান, তাহলে তার শিক্ষার বাহন যেন হয় ইংরেজী ভাষা। রামমোহন যখন একথা বলেছিলেন তখন ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কী ভাষা হবে শিক্ষার বাহন তাই নিয়ে চিন্তিত। কারো মত সংস্কৃত, কারো মত আরবী বা পারসী। তখনো মেকলে সাহেবের বিখ্যাত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। হয়েছিল এর পাঁচ বছর পরে।

চীৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ি। সেটা তখন ব্রাহ্ম সভার আপিস। রামমোহনই প্রতিষ্ঠাতা। মাসে ৫০ টাকা ভাড়া। রামমোহন মাসে ৪০ টাকা ভাড়ায় সেই বাড়ি ছেড়ে দিলেন ডাফ সাহেবকে। নিজে চলে এলেন অন্য জায়গায়। যাবার সময়, ছাদ থেকে ঝোলানো পাখা থেকে শুরু করে আরও যত আসবাবপত্র, সব দান করে দিলেন স্কুলকে। শুধু তাই নয়, নিজের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ জানালেন তাঁরা যেন নিজেদের ছেলেদের ঐ স্কুলে পাঠান।

এর আগে রামমোহন নিজের খরচে হেঁদুয়ার অর্থাৎ এখনকার আজাদ হিন্দ বাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে খুলেছিলেন একটা স্কুল। নাম অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল।

রাজা রামমোহনের আরো অনেক অপরাধ। যেমন, তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে। জাতিভেদের বিরুদ্ধে। তিনি বাঙালীর শারীরিক শক্তিচর্চার পক্ষে। শক্তিবৃদ্ধির জন্য

মার্বেলের টেবিলে টেবিলে ফুলদানীতে ফুল। সিঁড়িতে, বারান্দায়, হলঘরে, নানান জাতের অর্কিড আর লতাপাতা ফুল। মতিঝিলের সেতুও ফুল দিয়ে, পতাকা দিয়ে সাজানো। আলো জ্বলে স্থলে জলে সবখানেই। হলঘরে বাজনা। রাত মাঝামাঝি হলে নাচের আসর। ওদিকে বাইরে সেই সন্ধ্যের মুখ থেকে আতসবাজি ফাটছে, ফুটছে আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে। যারা চোখে দেখেছে, তাদের মতে কলকাতায় অমন জমকালো ভোজসভা আগে কোনদিন হয়নি।

ছড়ার ঠাকুর কোম্পানী হলো কার-ঠাকুর কোম্পানী। দ্বারকানাথের ব্যবসার নাম। কার অর্থাৎ উইলিয়ম কার। আর ঠাকুর অর্থাৎ দ্বারকানাথ। দুজনে একসঙ্গে মিলে একটা কোম্পানী। কার সাহেবের সঙ্গে দ্বারকানাথের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। দেশী এবং বিদেশী দু'পক্ষের টাকা এক জায়গায় জড়ো করে এইটেই আমাদের দেশে প্রথম স্বাধীন ব্যবসা।

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল।
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিনকুল।

এই ছড়া এক সময় স্কুলের ছেলেমেয়েরাও পথে-ঘাটে গেয়ে বেড়াতো। ছড়াটা অবশ্য তাদের নিজেদের লেখা নয়। তাদেরই গুরুজন স্থানীয় কারও লেখা। যাকে নিয়ে লেখা তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়। তাঁর অপরাধ ছিল একটা নয়, অগুনতি। তিনি ছিলেন এদেশের ভয়াবহ সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে। যে সময়ের কথা, তখন স্বামী মারা গেলেই স্ত্রীকেও চিতার আগুনে পুড়ে মরতে বাধ্য করা হতো। তখন ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের কাছে এটাই ছিল সমাজকে বাঁচানোর শাস্ত্রসম্মত উপায়। রামমোহন ছিলেন এই বর্বর নিয়মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। পাতার পর পাতা প্রবন্ধ লিখে, প্রতিবাদ লিখে

মাংসাহারের পক্ষে। তিনি মূর্তিপূজার পক্ষে নন। সব চেয়ে আশ্চর্য, তিনি হিন্দু হয়েও, ব্রাহ্ম হয়েও, তাঁর চোখ এবং মনের দরজা খুলে রেখেছিলেন অন্য ধর্মেরও মূল সত্যের দিকে।

বিলেত থেকে এল গোরা
মাথার 'পর কুর্তি পরা,
পদভারে কাঁপে ধরা
হাইল্যান্ড নিবাসী তারা।
টানটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা।

১৮৫৭ সাল। ভারতের বড়লাট তখন লর্ড ক্যানিং। সেই সময়ে বছরের একেবারে গোড়ায় ব্যারাকপুরের সিপাইরা বিদ্রোহ করে বসলো। তারা এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করবে না। এই নতুন রাইফেলে টোটা ভরতে গেলে, তার খানিকটা আগে ছিঁড়ে নিতে হতো দাঁত দিয়ে। সিপাইদের কানে এসেছিল এই টোটা শূকর আর গরুর চর্বি দিয়ে বানানো। ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে তখন ভারতীয় সেপাইরাই বেশী। তাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। দু'পক্ষেরই মনে সন্দেহ জাগলো, এটা তাদের জাত নষ্ট করার চেষ্টা।

এরও আগে আরও নানা কারণে সিপাইদের মনে ইংরেজদের সম্বন্ধে একটু একটু করে রাগ জমছিল। টোটা-র ব্যাপারটা সেই রাগের ধোঁয়াকে বিদ্রোহের আগুন করে জ্বালিয়ে দিলে। ২৮শে জানুয়ারী ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডে নামে একজন সিপাই প্রথম অস্বীকার করলো ঐ টোটা ব্যবহার করতে। বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে মঙ্গল পান্ডেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ফাঁসী কাঠে। ইংরেজরা শক্ত হাতে ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ থামিয়ে দিল বটে, কিন্তু ক'মাস যেতে না যেতেই ভারতবর্ষের আরও নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো সে

আগুন। ১০ই মে মীরাটে। ২৩শে মে বেনারসে, এলাহাবাদে আর কানপুরে। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌ-এ। তারপর একে একে দিল্লী, বেরিলী, আগ্রা আর ঝাঁসী। বিদ্রোহী সিপাইরা ঘোষণা করলে দিল্লীর মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহ হিন্দুস্থানের সম্রাট। তারা সেই সম্রাটের প্রজা। ইংরেজের কেউ নয়।

গোড়ার দিকে ইংরেজরা কাবু হয়েছিল খুব। তাদের লোকজনই মরলো বেশী। লুঠপাট হলো তাদের বাড়ীঘর, সোনাদানা, ধনদৌলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা কামান-বন্দুকের জোরে জিতে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই। তাঁতিয়া টোপীকে প্রাণ দিতে হলো ফাঁসীতে। নানা সাহেব পালিয়ে গেলেন নেপালের জঙ্গলে। বাহাদুর শা-কে নির্বাসন দেওয়া হলো রেঙ্গুনে।

এই ছড়ায় ফুটে রয়েছে সেই বিদ্রোহের সময়কার কলকাতা শহরের সাধারণ মানুষের মনের চেহারা। গোড়ার দিকে কলকাতায় তেমন ভয় বা আতঙ্ক দেখা দেয়নি। বরং বাংলাদেশের কাছে কলকাতাই ছিল তখন নিরাপদ আশ্রয়। বিপদে পড়লেই কলকাতা।

রাজনারায়ণ বসু তখন মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তখন মেদিনীপুরেও বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল। তাঁর জীবনচরিতে সেই সময়কার কথা বেশ মজা করে লেখা—

"পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন এক বন্ধুর বাটীতে শয়ন করিতাম।...একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। আমরাও প্যান্টুলুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতে ছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে এইরূপ ধূমধাম করিতেছে।"

কলকাতার অবস্থাও মেদিনীপুরের স্কুলের মত হয়ে উঠেছিল পরে। সারা শহর ভয়ে তটস্থ দিনে রাতে।

তারই মধ্যে একটা দিন ছিল বিশেষ করে স্মরণীয়। ১৪ই জুন। রবিবার। কোথা থেকে রটে গেল ব্যারাকপুরের সিপাইরা আসছে

কলকাতা দখল করতে। গুজব শুনে সাহেবরা পালাতে শুরু করলে মাঠ-ময়দান ঝাঁপিয়ে। কেউ গঙ্গার দিকে। জাহাজে চেপে পালাবে। কেউ কেল্লার দিকে। মাথা গুঁজে বাঁচবে। সে এক হৈ হৈ কান্ড। পরে জানা গেল সবটাই গুজব। ব্যারাকপুরের সেপাইরা ঐ রকম একটা ফন্দি এঁটেছিল ঠিকই। কিন্তু ফাঁস হয়ে যায় আগেভাগে। চুঁচড়োয় থাকতো ইংরেজদের হাইল্যান্ডার বাহিনী। তাদের আনিয়ে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে নেটিভ সিপাইদের।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলকাতায় সভাসমিতি হয়েছে অনেক। কাগজে পত্রে লেখাজোখাও হয়েছে প্রচুর। সবই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ রাজত্বের পক্ষে। তখন ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর সবচেয়ে নামজাদা কাগজ। আর ঈশ্বর গুপ্ত তখন সবচেয়ে নাম-ডাকওয়ালা কবি। তিনি তাঁর কাগজে লিখেছিলেন—

চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়
ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়।
বিদ্রোহী সেপাইগণ, করি নিবেদন
ছাড় দ্বেষ, রণবেশ, কর সম্বরণ
কার কথা শুনে সবে সেজেছো সমরে?
পিঁপীড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

এই সিপাই বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতবর্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যপাটের পালা শেষ। ১৫৫৮ সালের ২রা আগস্ট থেকে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাশ করানো হলো এক নতুন আইন। তার ফলে ভারতের শাসনভার চলে গেল মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এখন থেকে একজন করে ভাইসরয় ভারতবর্ষ শাসন করবে। ৫৮-র ১লা নভেম্বর এলাহাবাদে দরবার ডেকে পড়ে শোনানো হলো মহারানীর নতুন ঘোষণাপত্র। ইংরেজদের মুখ থেকে অনেক নতুন নতুন কথা সেদিন কানে এল ভারতবর্ষের মানুষের। এখন থেকে ভারতীয়রাও সরকারী চাকরী পাবে। সরকার কারো ধর্মে হাত ছোঁয়াবেন না। ইংরেজদের রাজ্যজয়ের লোভ নেই। তবে বিদ্রোহ করলেই শাস্তি।

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলো এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মলো,
লঙের হল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

সিপাই বিদ্রোহ হয়েছিল ভারতবর্ষ জুড়ে। নীলবিদ্রোহ শুধু বাংলাদেশের মাটিতে। এখনও বাংলাদেশের এপারে ওপারে অনেক ভাঙা বাড়ি ঘন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে আছে। ভিতরে বাদুড়ের বাসা। বাইরে বুনো জন্তুদের। গ্রামের লোককে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে, আজ্ঞে, ওটা একটা নীলকুঠি। নীলকর সাহেবদের বাড়ি। সংক্ষেপে নীলকুঠি। নীলকর সাহেব কারা? সাহেবরা তো লাল। নীল হলো কি করে? গায়ের রঙ নীল বলে নীলকর সাহেব নয়। নীলের চাষে যেসব ইংরেজ ব্যবসায়ীরা হাত, মাথা এবং গায়ের জোর লাগিয়েছিল, তারাই নীলকর সাহেব।

নীলের চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল চন্দননগরে। সেটা ১৭৭২ সাল। শুরু করেছিল একজন ফরাসী। নাম মঁসিয়ে লুই বোনার্দ। ইংরেজদের অমনি টনক নড়লো। আরে, নীল বেচে তো প্রচুর পয়সা। এখানে নীল বানাতে যা খরচ, লন্ডনের বাজারে সেটা তো বেচা যায় তিন গুণ বেশী দামে। শুরু হয়ে গেল নীলের চাষের ব্যবসা। বলতে গেলে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে। মনে রাখবে, তখনও বাংলাদেশ ভাগ হয়নি।

নীল বেচলেই প্রচুর টাকা। টাকার লোভে সাহেবরা দিন দিন চাষীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে চললেন। জোর-জুলুমের অন্ত নেই। বাজারে যখন নীলের দাম মণ পিছু ৩০ টাকা, সাহেবরা চাষীদের দিচ্ছে ৪ টাকা। তার ওপর আছে কেনার সময় ওজনের গোলমাল। জমিতে চাষের সময় জমির মাপে হেরফের। যে জমি সবচেয়ে উর্বরা, তাতে নীল ছাড়া অন্য কোনো ফসলের চাষ করা চলবে না। করলেই সাহেবদের পাইক-পেয়াদা উপড়ে ফেলে দেবে মাটিতে। এবং এসবের প্রতিবাদ করার উপায় নেই। করলেই ঘরবাড়ি জ্বলবে, লুট হবে গরু বাছুর, চাষীদের অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে চাবুক মারা হবে। চাষী পরিবারের মেয়েদের উপরেও চলবে লজ্জাহীন অত্যাচার।

বাংলাদেশের মানুষ নীলকর সাহেবদের এইসব অমানুষিক অত্যাচারের কথা জানতে পারে বিশেষ করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামের কাগজ থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর কলমই তখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সব চেয়ে ধারালো। ১৮৬১তে তিনি মারা যান। এই ছড়ায় তাঁর প্রতি বাঙালী মনের দরদ ও সমবেদনা। ছড়ার মধ্যে আরেকজন আছেন লং সাহেব।

নীলকরদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে লিখেছিলেন একটা নাটক। সেটাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে নিজের ঝুঁকিতে ছাপিয়েছিলেন লং সাহেব। তাতে সাহেবরা চটে গিয়ে মোকদ্দমা ঠুকে দেন আদালতে। তাতে লং সাহেবের জরিমানা হয় এক হাজার টাকা। আর সেই সঙ্গে এক মাসের কারাদন্ড। জরি-মানার টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাহি থাকে যার ।
উপাধি বিষম ব্যাধি ঘাড়ে চাপে তার ।

ঠিক কোন্ সময়ে কোন ব্যক্তির উপাধি পাওয়াকে মনে রেখে এই বিদ্রুপ-বেঁধা ছড়াটা তৈরি হয়েছিল, তা এখন খুঁজে বের করা মুশকিল । তবে কোন আমলে তৈরি সেটা অনুমান করে নেওয়া খুব কঠিন নয় । পলাশীর যুদ্ধে জিতে যাওয়ার পর থেকেই দরাজ হাতে ইংরেজ রাজপুরুষদের উপাধি পেয়েছিলেন বিতরণের ধূম । কেউ হয়ে যাচ্ছেন রাজা, কেউ মহারাজা। মুন্সী নবকৃষ্ণ-র মহারাজা উপাধি ক্লাইভের আমলে । লোকনাথ ঘোষ-এর 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত' থেকে আমরা শুনে নিতে পারি সেই উপাধি উপার্জনের বৃত্তান্তটাও ।

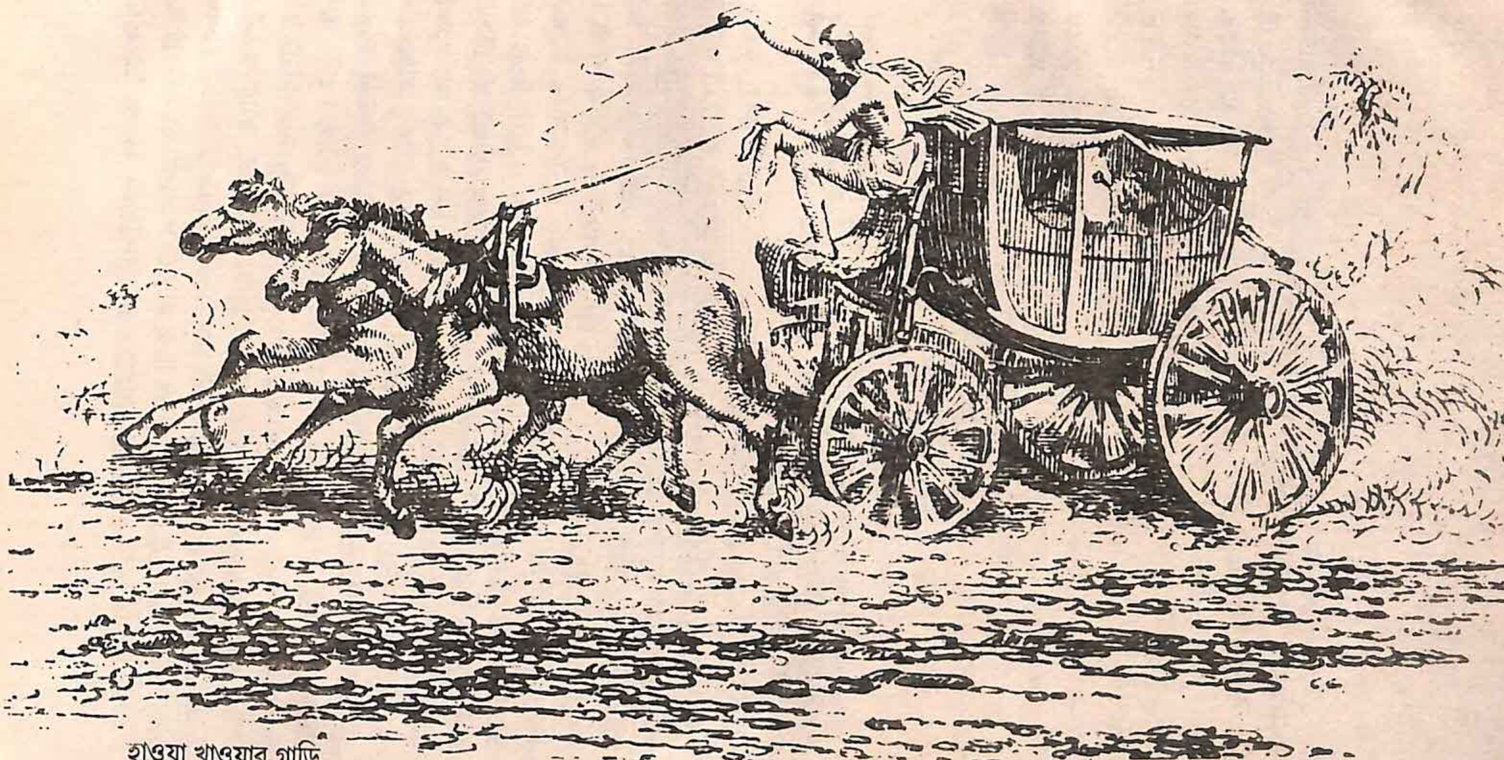
"১৭৭৫-এ লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে নবকৃষ্ণ এলাহাবাদে গেলে বাদশাহ্ শাহ আলম তাঁকে তিন হাজার সওয়ার 'পঞ্চহাজারী মনসবদারে'র মর্যাদা এবং তার সঙ্গে 'পাল্কী ঝালরদার টোগা, নখারা' প্রভৃতি ব্যবহারের অনুমতি দান করেন । তাঁর কাছে কোম্পানি যে মূল্যবান সেবা ও উপকার পেয়েছিলেন তার জন্য এবং আর্কটের নবাবের কাছে তাঁর উচ্চবংশের পরিচয় পেয়ে মহামান্য বাদশাহ আলমের কাছ থেকে তাঁর জন্য চার হাজার সওয়ারির

অধিকারী, মনসব দশহাজারী ও মহারাজ বাহাদুর খেতাব পাইয়ে দেন। এছাড়া তাঁর মহামূল্যবান সেবার কথা ফার্সীতে খোদাই করে তাঁকে একটি সোনার পদক উপহার দেন ; এ ছাড়া লর্ড ক্লাইভ তাঁকে সাম্মানিক পোশাক, হীরে, জহরৎ, তরবারী, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি উপহার দেন ; আর তাঁর তোরণদ্বার পাহারা দেবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সিপাহীর বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁকে খেলাৎ দান অনুষ্ঠানের শেষে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে স্বয়ং হাতীর হাওদা পর্যন্ত নিয়ে যান ; অনুষ্ঠানটির পর মহাআড়ম্বরে এক শোভাযাত্রা করে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয়।"

উপাধি বলতে যে শুধু রাজা মহারাজা রায় বাহাদুর, তা কিন্তু নয়। এখন আমরা যে কোন লোককেই ডাকি তাঁর নামের শেষে 'বাবু' জুড়ে। কিন্তু এক সময় 'বাবু'ও ছিল উপাধি। যে কেউ নিজের নামের আগে যেমন লিখতে পারতেন না বাবু, তেমনি সমাজের মানুষও যে-কোনো লোককে সম্বোধন করতে পারতেন না 'বাবু অমুক'। 'বাবু' উপাধিটাও অর্জন করতে হত রাজা-মহারাজার মতই। পাওয়া যেত নবাবের অনুগ্রহে। পরে কোম্পানীর তদ্বিরে। শুধুমাত্র ইংরেজের মোসাহেবি করেই যারা তখন উপাধি পেয়েছে কোনো না কোনো, এ ছড়ার ঠাট্টা-বিদ্রূপের তীরটা তাঁদের দিকেই তাক করা।

গাড়ী ঘোড়া লোনা পানি,
আউর রণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়
এস্‌মে যে বঁচে মুসাফির,
মৌজ করে কলকত্তা হ্যায়।

এ ছড়াটা হিন্দুস্থানীদের বানানো। ঠিক কোন সময়ে চোখ-ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার টানে তারা ছুটে এসেছিল দূর দেশ থেকে, আর ঠিক কোন্ সময়ে এই শহরটা হয়ে উঠল তাদের চোখের বালি, তার সাল তারিখসহ ইতিহাস জানা নেই আমাদের। তবে ১৮২৭ সালটাকেই প্রথম মনে পড়ার কথা। ঐ বছরেই কলকাতায় প্রথম ধর্মঘট, পাল্‌কির। যে সময়ের



হাওয়া খাওয়ার গাড়ি

কথা তখন পাল্‌কিই কলকাতার প্রধান যানবাহন। তাই পাল্‌কি-বেয়ারাদের দাপাদাপিটা কিঞ্চিৎ বেশি। যাত্রীদের হ্যানস্থা তো আছেই। তাছাড়া আছে ভাড়া নিয়ে বিভ্রাট। কখন কী চেয়ে বসবে তার ঠিক নেই কোনো। ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে খিটিরমিটির ঝগড়া-ঝাটিটা যখন বেশ একটা বাড়াবাড়ি রকম জায়গায় গিয়ে পৌঁছল, তখন একদিন হুকুম জারি হল নগরপালের যে, প্রত্যেক পাল্‌কি বেয়ারাকে লাইসেন্স করতে হবে। নইলে পাল্‌কি বইতে পারবে না। তা থেকেই ধর্মঘট। কলকাতায় তখন বেয়ারাদের সংখ্যা এগার হাজার কয়েক শ। তারা কোম্পানীর হুকুম না মেনে ময়দানে মিটিং করে এককাট্টা হয়ে চলল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দরবারে। আমরা হাতে ব্যাজ পরতে পারব না। ওতে আমাদের জাত যাবে। ব্যাজ যদি পরতেই হয় বাধ্য হয়ে, তার দাম দেবো না। দাম দেবে কোম্পানী। ম্যাজিস্ট্রেট নাকচ করে দিলেন ব্যাজের দাম দেওয়ার ব্যাপারটা। তাতেও কিন্তু ধর্মঘট মেটার নাম নেই। তারা ঘণ্টা হিসেবে মজুরী নিতে রাজী নয়।

কলকাতায় তখন রাস্তার ভাড়াটে পাল্‌কি ছাড়াও, নিজস্ব পাল্‌কি ছিল অবস্থাপন্ন বহু পরিবারেই। ভাড়াটে পাল্‌কির ধর্মঘটে তারাও যখন যোগ দিল দল বেঁধে, সমস্যাটা হয়ে উঠল ভয়াবহ। আপিস আদালত বন্ধ হওয়ার মত অবস্থা। চাকরি-বাকরিতে ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে লোকেরা হিমশিম। সারা শহরটাই যেন ঘরবন্দী। ঠিক সেই সময়ে বিহারের হিন্দুস্থানী রাউনি বেয়ারারা কলকাতায় চলে এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে। তারা এসে পাল্‌কিতে কাঁধ দিতেই আবার গমগমিয়ে উঠল শহরের রাস্তা-ঘাট পাল্‌কির হাঁকে-ডাকে। জেগে উঠল ঘুমোনো শহরটা। নিজেদের জাত-ব্যবসায় হিন্দুস্থানী বেয়ারাদের এই রকম জাঁকিয়ে বসা দেখে কলকাতার আদি উড়িয়া বেয়ারারা তুলে নিলে তাদের ধর্মঘট। আবার কাঁধ লাগাল পাল্‌কিতে। হিন্দুস্থানীরা যে তাই বলে শহর ছেড়ে চলে গেল তখুনি তা কিন্তু নয়। রয়ে গেল এই শহরেরই পাকাপাকি নাগরিক হয়ে। পরে এই সব দেশোয়ালির পায়ের ছাপে পা মিলিয়ে আরো অনেকেই ছুটে আসতে লাগল কলকাতায়। তখনই হয়তো তাদের এ ছুটে-আসাটাকে আটকাতে হিন্দুস্থানীরা এই ছড়াটা ছড়িয়ে দিয়েছিল বাতাসে। যাতে নবাগতরা ভয় পায়। কিংবা বুঝতে শেখে যে কলকাতা শহরটা খুব একটা আহ্লাদে-আমোদে গা-ভাসিয়ে বেড়াবার শহর নয়।

দুই তিন আনা ভিন্ন
সোডা নাহি মিলে,
খাসা ডাব পাই এক
ঘষা পাই দিলে।

এ ছড়ার জন্মকাল খুব জোর একশ বছর আগে। দরদস্তুর থেকেই বুঝে নেওয়া যায় সেটা। ১৮১২ সালে মেসার্স টোল অ্যাণ্ড কোং-ই প্রথম বিলেত থেকে নিয়মিত সোডা আনানোর ব্যবস্থা করেছিল কলকাতায়। সোডার অভাবে সাহেব-সুবোদের তখন মন-মেজাজ নিমপাতার মত তেতো। মদের গেলাসে সোডা মেশাতে পারল প্রথম যেদিন, কী উল্লাস সাহেব পাড়ায়। তবে কলকাতার যা চাহিদা, তার চেয়ে মাল আসত অনেক কম। এক ডজন সোডার বোতলের দাম তখন চোদ্দ টাকা। বোতল ফেরত দিলে বারো টাকা। পরের বছর অবশ্য দামটা নেমে এল দশ টাকায়। চার বছর পরে কেমিস্ট সি হগকিনসন বিজ্ঞাপনের মারফৎ জানিয়ে দিলে যে তারা এখন থেকে সোডা তৈরি করছে কলকাতাতেই। আর সেটা বিদেশ থেকে আনানো সোডার চেয়ে কম সুস্বাদু নয় এতটুকু। ডজন ন'টাকা।

সোডা ব্যবহারের প্রথম দিকে, বোতল নিয়ে নয় সমস্যা হতো বোতলের ছিপি খোলা নিয়ে। আনাড়ি হাত ছিপি খুলতে গেলেই, ভিতরের সোডা হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে আসত বাইরে। অর্ধেকটাই বরবাদ। সাহেবরা বাটলারদের পাখি পড়ানোর মত করে শেখাতেন কাকে বলে সোডা, তৈরি হয় সেটা কি ভাবে, কেন ছিপিটা সাবধানে না খুললে ভিতরের সোডা ফোয়ারার মত ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শুনে একবার একজন বিস্মিত বাটলারের মন্তব্য যে-জল বোতল খুললেই ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে তোমরা সে-জলকে বোতলে ঢোকালে কি করে ?

আস্তে আস্তে কলকাতার নানা জায়গাতেই খুলে যায় সোডা তৈরির কারখানা। উৎপাদনের প্রাচুর্যের সঙ্গে দামটাও কমতে থাকে ক্রমশ। কমতে কমতে একদিন দুআনা-তিন আনায়। সোডা যখন ঐ দামে, তখন ডাব পাওয়া যাচ্ছে পাই পয়সায়। এখন অবশ্য বদলে গেছে সে দিনকাল। এক বোতল সোডার চেয়ে শাঁসে-জলে ভরা একটা ডাবের দাম অনেক বেশি।

জন্ম মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁশ।

এ ছড়ার নিমু হলেন নিমাইচরণ গোস্বামী। আহিরাটোলায় তাঁর নামে রাস্তা, নিমু গোঁসাইয়ের লেন। প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে অসম্ভব ঘটা করে বলরামের রাসোৎসব করতেন। নিজের বাড়িতেই ছিল বলরামের বিগ্রহ। রাসের জাল খাটানোর জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে তৈরি হত বিরাট বিরাট স্তম্ভ, ৪০-৫০ টা বাঁশ একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে। ফলে স্তম্ভগুলো তৈরি হওয়ার আগে প্রাঙ্গণটা ভরে যেত শয়ে শয়ে বাঁশে। ঐ বিপুল সংখ্যক বাঁশ প্রত্যেক বছর দেখতে দেখতেই সম্ভবত তৈরি হয়েছে এই ছড়া। কিন্তু ছড়ার খোঁচাটা শুধু বাঁশকেই নয়, স্বয়ং নিমুকেও। যেহেতু সারা বছর আর সব পুজো-পার্বণে ঘুমিয়ে থেকে একবারই তিনি জেগে ওঠেন এই অসময়ের রাসে। কলকাতায় তখন রাস-উৎসব হতো নানা জায়গায়। প্রাণকৃষ্ণ দত্তের 'কলকাতার ইতিবৃত্তে' রয়েছে তার কিছু বিবরণ। সে-সব রাস রাসের সময়েই, অর্থাৎ কার্তিক-পূর্ণিমায়। রাস হতো গোকুল চন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে।

"গোকুলবাবু রাধা-মদনমোহনের ঠাকুরবাটি, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সমস্ত পর্ব যথেষ্ট অর্থব্যায়ে সম্পন্ন করিতেন। তন্মধ্যে রাসোৎসবটিই প্রধান, তদুপলক্ষে কোন আমোদ-তামাসার ত্রুটি হইত না। ঠাকুরবাটির দক্ষিণে বৃহৎ একটি দীঘি ছিল। তাহাতে চারিখানি নৌকা ভাসাইয়া স্ত্রীলোকদের কবিগান হইত। অনেক প্রকারের সং এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি টাঙানো হইত, সুবৃহৎ রাসমঞ্চের সম্মুখে সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে অবিশ্রান্ত নৃত্য-গীত হইত, দর্শকদের জনতায় সম্মুখস্থ চিৎপুর রোডে যাতায়াত করা দুরূহ ছিল।…সিম্‌লিয়ার অনাথনাথ দেবের বাজারের দক্ষিণে বাবু বংশীধর মিত্রের বাটি, তাঁহার বাটীতেও রাস উপলক্ষ্যে আমোদ হইত। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা প্রকার বহুমূল্য বৃহদাকার ছবি ও পুত্তলিকা ইত্যাদির দ্বারা গৃহকে এমন চমৎকার সাজান হইত যে, উপরোক্ত কয়েকটি বিখ্যাত রাসের কোথাও তেমন হইত না।"

এ ছড়ায় নিমুকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টার কারণটা কি তাহলে এই যে, অন্যদের মত রোশনাই জ্বালিয়ে জাঁক-জমক দেখানোর দাপট ছিল না তাঁর ?

কারুর কিছু হারিয়েছে ?
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে।

বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহের গৃহদেবতা মদনমোহনের বিগ্রহ এক লাখ টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন বাগবাজারের গোকুল মিত্র। দীর্ঘকাল পরে দামোদর সিংহ যখন বন্ধুকে টাকা ফেরত দিয়ে নিজের গৃহদেবতার মূর্তি ফেরত চাইলেন তখন গোকুল মিত্র তাঁকে পাশাপাশি রাখা দুটি মদনমোহন বিগ্রহের কোনটি তাঁর নিজের বেছে নিতে বললেন। আসল বিগ্রহের নকলে গোকুল মিত্র ইতিমধ্যেই বানিয়ে নিয়েছিলেন আরেকটি। নকলে সোনা কম। আসলে সোনা বেশি। তারপর শহরে ছড়াল গুজব যে রাজা নকলটাকেই বেছে নিয়েছেন নিজের আসলটা ভেবে।

"সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোনার মদনমোহন বাঁধা দিয়ে গেল।"

এই ছড়া নিয়ে নানান মতভেদও রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। যেমন মদনমোহনটা সোনার ছিল না আদৌ। ছিল কালো পাথরের। আর রাজা দামোদর সিংহ মোটেই ভুল করেননি নিজের আসল মূর্তিটা বেছে নিতে। এসব ছড়ার মধ্যে **সত্যি**-মিথ্যা যাই থাকুক, একটা জিনিস সত্যি যে, শহরের মানুষ শহরের যে-কোনোঘটনাতেই আলোড়িতই হত না শুধু, সঙ্গে সঙ্গে ছড়া অথবা গান লিখে নিজেদের প্রতিক্রিয়াটাও ছড়িয়ে দিত শহরের বাতাসে-বাতাসে, অলিতে-গলিতে, ঘরে-ঘরে।
যে-কলকাতা এখন আর নেই, ইতিহাসের পাতা ঘেঁটেই খুঁজতে হয় এখন যাকে, এই সব ছড়া বা গানের বা কবিতার টুকরো থেকেই আমরা পেয়ে যাই তার তখনকার স্পন্দিত সময়ের স্বাদ।

চলতি ঘটনা নিয়ে মানুষ তখুনি তখুনি ছড়া বানাতে ভালবাসে। তাই দেখা যায় সে-সব ছড়ার মধ্যে থেকে গেছে এক এক যুগের নানান মজার কাহিনী, অজানা ইতিহাস। কলকাতা নামের এই শহরকে ঘিরেও সে-রকম অনেক ছড়া নানা জায়গায় ছড়ানো। এ-বইয়ে সেগুলোকে সাজিয়ে দেওয়া হল এক জায়গায়। আগে ছড়া। পরে তার ইতিহাস। পড়লেই বুঝবে কী মজাই না বোঝাই হয়ে আছে এ-সব ছড়ার ছত্রে ছত্রে।

